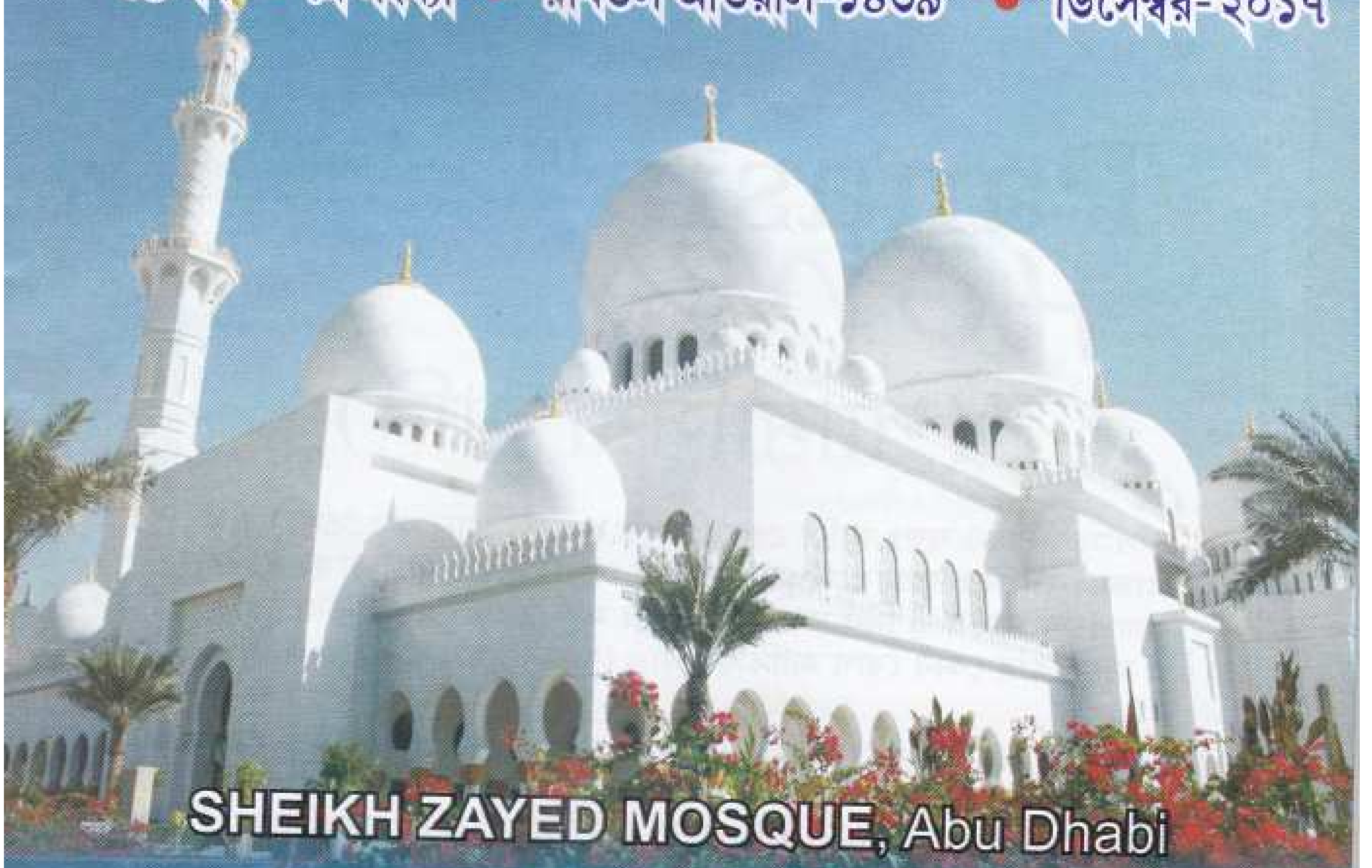
মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল ক্বুরআন ১৯ : ৩৬

৬ষ্ঠ বর্ষ • ৭ম সংখ্যা • রবিউল আওয়াল-১৪৩৯ • ডিসেম্বর-২০১৭



SHEIKH ZAYED MOSQUE, Abu Dhabi

www.masiksaralpath.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

সরল পথ

রেজিঃ নংঃ WBBEN/2012/45211

৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ৭ম সংখ্যা
রবীউল আওয়াল-রবীউস্ সানী ঃ ১৪৩৯ হিজরী
অগ্রহায়ণ-পৌষ ঃ ১৪২৪ বাংলা
ডিসেম্বর ঃ ২০১৭ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

সূচীপত্র **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়

নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত নয় — মূল্যবোধ সমন্বিত শি(া ব্যবস্থাই সময়ের দাবি

সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে নিত্য-নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। ব্যাঙের ছাতার মতো নব কলেবরে গজে উঠছে অগণিত শিশু শিক্ষালয়। বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তার ভিন্ন ধর্মী ঘোষণা। কেউবা বানাবে প্রোথিতযশা বিজ্ঞানী, কেউবা বানাতে চায় ধন্বন্তরী ডাক্তার, বড়ো বড়ো উকিল, ব্যারিস্টার, কেউবা বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার — এককথায় সুদক্ষ অ্যাকাডেমিসিয়ান বা ভুবন বিখ্যাত কেরিয়ারিস্ট। কিন্তু সুশীল সমাজ বিনির্মাণের মৌল একক যে 'মানুষ' সেটা তৈরি হবে কোন্ কারখানায়? একবিংশ শতাব্দীতে কিবা প্রাচ্য কিবা পাশ্চাত্য সবখানেতেই শিক্ষার জোয়ার এসেছে ঠিকই, কিন্তু কোন্ সে শিক্ষা? বিদ্যায়তনগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি ডিগ্রীধারী ও পেশাগত কর্মী উৎপাদনের কারখানাতে পরিণত হয়েছে। ফলস্বরূপ, অনেক প্রবাদপ্রতিম শিক্ষকই শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন, শুধু এ কারণেই যে, শিক্ষালয় আর 'মানুষ' তৈরির কাজ করেনা; এগুলি পরিণত হয়েছে রেজাল্ট তৈরির ফ্যাক্টরীতে সে যে কোনো মূল্যেই হোক। মানবিকতা ও নীতি নৈতিকতার কোনো স্থান নেই সেখানে। আত্মঘাতী সভ্যতায় ক্লিষ্ট 'মানুষ' আজ তাই জাগতিক সুখের পরিবর্তে পারলৌকিক সুখের আশায় প্রহর গুনছে। দেহের অন্নের পাশাপাশি প্রাণের পরমান্ন, প্রকৃত সুখ-শান্তির যে অভীপ্সা মানব মনের একটি সহজাত প্রবৃত্তি, সেটা কীভাবে লাভ করা যায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তার কোন দিশা নাই। আধ্যাত্মিক বোধ-চেতনা রহিত আজকের মানুষের যান্ত্রিক সভ্যতা বাস্তবে আত্মঘাতী সভ্যতায় রূপান্তরিত। এর সংক্রমণ ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতি-আন্তর্জাতিক গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বপরিবার পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশ্বজুড়ে তাই আজ লোভ-অন্যায় ও অবিচারের অস্থিরতা। একারণেই স্বনামধন্য দার্শনিক তথা ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবী (Arnold J. Toynbee) বলতে বাধ্য হয়েছিলেন "Civilizations die from suicide, not by murder" (সভ্যতাকে কেউ বাইরে থেকে হত্যা করেনা, বরং তার মৃত্যু হয় আত্মহননের পথে)। মজার কথা, আজ বিত্ত বৈভবের দেশ আমেরিকাতে কিশোরদের মধ্যে অপরাধের হার ৬০০ শতাংশ, জাপানের ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশী। পৃথিবীর ধনী দেশ বলে পরিচিত সুইডেনে ২০ শতাংশ ছেলেদের দ্বারা বাপ-মা নিত্য দৈহিক নির্যাতনের শিকার। পৃথিবীতে ৪১.০৬ শতাংশ মানুষ আজ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। বিশ্বের প্রায় সাড়ে সাতশো কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেকের কাছাকাছি মানুষের বসতি আজ পৃথিবীর দূষিততম শহরে। তাই আজ সখেদে কবির ভাষায় বলতে হয় মানুষের ঃ — 'সুখ নেই কো মনে'। দার্শনিক বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের ক্ষিপ্ত উক্তি — 'যে যন্ত্রকে ঘিরে আমাদের সভ্যতার বড়াই সেই যন্ত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক শয়তান।' একদিকে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে একটা অংশ ব্যুরোক্রাট্স; আরেকটি অংশ টেকনোক্রাট্স। এটাই আজকের নির্মম বাস্তবতা। চরম বস্তুবাদী চেতনার ফল হলো — তীব্র প্রতিযোগিতা, নাস্তিকতা, নীতিহীনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। তাই বিশ্ব জুড়ে ভাঙছে মূল্যবোধ। যৌথ পরিবার ভেঙে খান্ খান্, বিবাহের পরিবর্তে তরুণ প্রজন্মের লিভ টুগেদারের উদগ্র বাসনা, ডিভোর্স রেটের ক্রমবৃদ্ধি, বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের যোগ্য আবাসস্থল হলো আজ বৃদ্ধাশ্রম, যুবসমাজে চটুল উন্মাদনা, মাদকাশক্তি, নেশা, জুয়া, নাইট ক্লাব, ডিসকো এসব অন্যায় অপরাধের অগ্রগতির। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হলে গণটোকাটুকি, টিভি সিরিয়াল ও চলচ্চিত্রে বিকৃত ছবি প্রদর্শন, সহিংসতা, নারী শরীরের বিজ্ঞাপন, জীবন শৈলী শিক্ষার নামে সুক্ষ্ম যৌন চেতনা বৃদ্ধি, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের অবনমন — এসব অপসংস্কৃতির দীর্ঘ তালিকা। এহেন আত্মঘাতী বিষবাষ্পের পরিবেশ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে কুরআনী শিক্ষার সুশীতল ছায়াতলে — যেখানে দেওয়া হয় মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা ও হৃদয়-আত্মার পবিত্রকরণের ও পরিতৃপ্তির শিক্ষা। একারণেই স্বয়ং আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের ঘোষণা — ''তিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রসুল রূপে, যিনি তাদের নিকট আবৃত্তি করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা, যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।'' (সূরা জুমুআহ-আয়াত-২)

- আবু ফাইসাল সালমান

দারসে কুরআন (কুরআনের পাঠ)

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিঃসন্দেহে একজন মানুষ ছিলেন

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

হে নাবী! আপনি ঘোষণা করে দিন, বস্তুতঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে আমার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয় (অহী আসে)। নিশ্চয় তোমাদের উপাস্য কেবল একজনই। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সাক্ষাতের আশাধারী সে যেন সৎকার্য সম্পাদন করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপাসনাতে অন্য কাউকে শরীক না করে (সূরাতুল কাহ্ফ, ১১০)।

আয়াতে উল্লেখিত শব্দ مِثْلٌ (মিস্‌ল) কে নিয়ে প্রথমে আলোচনা। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, তুলনা দেওয়ার জন্য আরাবী ভাষায় مَثَلٌ (মাসালুন) ও مِثْلٌ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মিস্‌লুন শব্দটি একমাত্র সেই স্থানেই এসেছে যেখানে তুলনাকৃত দুটি বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তির মধ্যে একশ ভাগ মিল রয়েছে। যেমন সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ১১৩, ১১৮, ২২৮, ২৩৩, ২৭৫,, সূরাহ্ আল ইমরাণের ৭৩, সূরাহ্ নিসার ১১, ১৭৬, সূরাতুল মায়েদাহ্ ৩১, ৯৫, আন্‌আমের ৯৩, ১২৪, আ'রাফের ৩১, ইউনুসের ২২০, হুদের ৮৯, মুমিনুনের ৮১, কাসাসের ৪৮, ৭৯, ফাতিরের ১৪, গা-ফিরের ৩০,৩১, ফুস্‌সিলাত ১২, যারিয়াত ২৩, ৫৯ এবং মুমতাহানাহ্‌র ১১ নং আয়াত সমূহে ব্যবহৃত মিসল শব্দযুক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে। কিন্তু মাসালুন শব্দটি শুধুমাত্র তুলনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে শতাংশের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

বিশেষভাবে আলোচ্য আয়াতে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে 'আমি তোমাদেরই মত মানুষ' বলে ঘোষণার বাক্যে ওই শব্দটি এনে বলানোর উদ্দেশ্যই হল, তিনি জন্ম, মানবীয় প্রয়োজন, গুণাবলী এবং পরিণতির দিক দিয়ে অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ। তাঁর মাতা-পিতা ছিলেন, দুগ্ধপান করেছেন, শৈশব, কৈশর, যৌবন, বিবাহ দাম্পত্য, সন্তানের জনক, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, চলার পথে বিচ্যুতি, শত্রুভীতি- আতঙ্ক এসব কিছুই মানবীয় গুণ যা সম্পূর্ণই মহান নাবী মুহাম্মাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। সেজন্য তিনি যে একজন মানুষ ছিলেন এমন অলংঘনীয় সত্যকে একমাত্র আযালের মরা, হঠকারী এবং দলীলের শত্রু ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে। অন্যান্য মানুষ হতে পার্থক্য নির্ণয়কারী বৈশিষ্ট্যসমূহই তাঁকে সেরা মানব, রসূল ও আদর্শ নাবী হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে আমি মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, "তোমরা আমাকে এমন বাড়াবে না যেমনটা করেছে খ্রীষ্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামকে নিয়ে। বস্তুতঃ আমি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা বা দাস। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র দাস ও তাঁর রসূল বলে মনে করো" (সহীহুল বুখারী ৩৪৪৫, সুনানু দ্দারিমী ২৮২৬)।

তিনি যদি অতি মানব বা অন্য কিছু হতেন, তাহলে কাফিরগণ এ ভাষায় বিরোধিতা করতো না। মহান আল্লাহ্ বলেন—

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا.

লোকেদের নিকট সত্য পথের দিশা (আল্লাহ্‌র নিকট হতে) আসার পরেও তা হতে তাদেরকে বাধা প্রদান করেছে শুধু এই ভাবনাই যে আল্লাহ্ কি একজন বাশার বা মানুষকে রসূল করে পাঠিয়েছেন?

মহান আল্লাহ্ তার জবাবে বলেছেন —

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا.

হে নাবী! আপনি বলে দিন, যদি পৃথিবীর অধিবাসী ফেরেশতা (মালাইকাহ্) হত যারা পৃথিবীতে শান্তভাবে চলাফেরা করত তাহলে আমি আকাশ হতে তাদের জন্য রসূল হিসাবে মালাক বা ফেরেশতাকে পাঠাতাম (সূরাতুল ইস্‌রা ৯৪-৯৫)।

অর্থাৎ যেহেতু পৃথিবীর অধিবাসী মানুষ সেজন্য মানুষের মধ্য হতেই আমি রসূল পাঠিয়েছি। আদম (আলাইহিস্ সালাম) ছিলেন প্রথম মানুষ। তাঁর সময়ের যারা মানুষ ছিল তাদের জন্য তিনি আদম

(আলাইহিস্ সালাম) কেই পৃথিবীর প্রথম নাবী করেন (হাদীস সহীহ্, মিশকাত ৫৭৩৭)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আমি আদাম (আলাইহিস্ সালাম) এর সন্তানের নেতা হবো কিয়ামতের দিনে, আমার কবর প্রথম উন্মুক্ত হবে (আমিই প্রথম ব্যক্তি কবর হতে উঠব)। আমিই প্রথম সুপারিশকারী হবো এবং সর্বপ্রথম আমারই সুপারিশ গৃহীত হবে (সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত ৫৭৪১)।

সমস্ত রসূলগণই মানুষ ছিলেন। তাঁদের অনুসারীরা বলে ছিল— وَ لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ.

যদি তোমরা তোমাদের মতই মানুষের অনুসরণ কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতির শিকার হবে (সূরাতুল মুমিনূন ৩৪)।

সুতরাং নাবিয়্যুনা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সম্পর্কে যে বলা হচ্ছে তিনি 'নূরের' তৈরি নাবী, এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং নাবীর ব্যক্তিত্বকে সীমালংঘনের মাধ্যমে তাঁর মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করা। যেটা একটা গর্হিত অপরাধ। যে কারণে নাবী (আলাইহিস্ স্বলাতু ওয়াস্ সালাম) এর প্রতি ঈমান অবশ্যই বিদ্ধস্ত ও বাতিল বলে গণ্য হবে। দলীল হিসাবে তারা আল্ কুরআনের আয়াত

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآئَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآئَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ.

হে আহ্লি কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) আমার রসূল তোমাদের নিকট আগমন করেছেন যিনি তোমরা যা কিছু গোপন করছিলে তা তিনি খুলে বলেন ও অনেক বিষয় (তোমরা যাতে আরও বেশি অপমানিত না হও) স্পষ্ট করেন না। তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হতে 'নূর' ও 'স্পষ্ট কিতাব' এসেছে (সূরাতুল মায়েদাহ্ ১৫)

উক্ত আয়াতে নূর এবং কিতাবে মুবীন শব্দ দুটি একই বিষয়ের জন্য বলা হয়েছে। আরাবী গ্রামার অনুযায়ী এখানে সংযোগকারী অব্যয় 'ওয়াও' পৃথক দুটি বিষয়কে বাক্যে সংযুক্ত করার জন্য আসেনি। বরং এটা এসেছে 'আত্ফি বায়ান' বা তার পূর্বের শব্দ 'নূরের' স্পষ্টকরণের জন্য। অর্থাৎ নূর ও কিতাব একই বস্তু পৃথক দুটি নাম। তবে যাঁরা নূর হতে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বুঝিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র রসূল এই অর্থে নূর ও আলো যে তাঁর দ্বারা মনের অন্ধকার দূরভীত হয়। যেমন আমরা কোনো ব্যক্তি বা ভাল ছেলে জন্য বলি, ''ছেলেটি বা লোকটি দেশের জ্যোতি বা আলো।'' যদি অব্যয়টি পৃথক পৃথক দুটি বিষয়ের সংযোগ স্থাপনের জন্য এসে থাকত তাহলে পরবর্তী আয়াতে —

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আল্লাহ্ তার দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন যে শান্তির পথ ও পন্থার উপর নিজেকে পরিচালিত ক'রে তাঁর (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি কামনা করে ......। এখানে আল্লাহ্ তাআলা يَهْدِىْ بِهِمَا দ্বিবচন ব্যবহার করেননি। ফলে একথা স্পষ্ট যে নূর ও কিতাব অভিন্ন বস্তুর জন্যই ব্যবহার হয়েছে। হাফিয ইবনু কাসীর বলেন —

ثُمَّ اَخْبَرَ تَعَالٰى عَنِ الْقُرْآنِ الَّذِىْ أَنْزَلَهٗ عَلٰى نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ فَقَالَ قَدْ جَائَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ আল্ কুরআন সম্পর্কেই মহান আল্লাহ্ উক্ত বাক্যটি বলেছেন, (দ্রষ্টব্য - তাফসীর ইবনু কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর)।

আল্লাহ্র রসূলের উক্তি, 'সর্বপ্রথম আমার নূর, মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন' মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ভিত্তিহীন। তাছাড়া সহীহ্ হাদীসে স্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্ 'কলম' কে সৃষ্টি করে সমস্ত সৃষ্টির তাকদীর লিপিবদ্ধ করতে বলেন (সুনানু আবী দাউদ, ৪৭০০, হাদীস সহীহ্)। সুতরাং সহীহ্ হাদীসের বিরুদ্ধে ভেজাল হাদীসের আমদানী উম্মাতকে ছিন্নভিন্ন করার জন্যই হয়ে থাকে। অপর একটি কথা যে, 'হে মুহাম্মাদ তুমি না হলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না' মর্মে আল্লাহ্র নামে একটি ডাহা মিথ্যাচার। যা বিখ্যাত কোনো হাদীসের গ্রন্থেই নেই। আছে মাত্র কবর নিয়ে ব্যবসায়ীদের গ্রন্থে ও তাদের ভ্রষ্ট উত্তরসূরী সূফিদের প্রলাপে। যাই হোক, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অবশ্য মানুষ ছিলেন, তবে সাধারণ মানুষ নন। তিনি ছিলেন নাবী ও রসূল। শ্রেষ্ঠ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্ম ৯ই রবিউল আওয়াল সোমবার হয়েছিল। এটা স্বীকৃত কথা। ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার তাঁর মৃত্যু তাঁর মানুষ হওয়াটাকে আরও সিদ্ধ করে। তাঁর জন্মদিন অথবা মৃত্যুদিন পালন তাঁর পরে বেঁচে থাকা অসংখ্য সাহাবী, তাবেয়ী, চার ইমাম, মুহাদ্দিসীন কারও হতে কোনো প্রমাণ নেই। অতএব ঈদে মীলাদুন্নাবীর নামে যা কিছু হচ্ছে তাতে অমুসলিমদেরই লাভ বেশি। হে আল্লাহ্! আমাদের আকীদাহ্ সহীহ্ ও সঠিক করার তাওফীক দাও — আমীন।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

দিক নির্দেশকের প্রতিদান

আতাউর রহমান সালাফী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَ مَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি কোনো হেদায়েতের দিকে আহ্বান জানায়, ঐ ব্যক্তি ঐ হেদায়েতের অনুসারীদের সমপরিমাণ প্রতিদান পায়। এ প্রতিদানপ্রাপ্তি তাদের প্রতিদানে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি করেনা। যে ব্যক্তি কোনো ভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বান জানায়, ঐ ভ্রষ্টতার অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহ আহ্বানকারী ব্যক্তি পায়। এতে তাদের পাপে কোনো ঘাটতি হয়না'' *(সহীহ্ মুসলিম; অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি ভাল অথবা মন্দ পদ্ধতি চালু করে এবং যে ব্যক্তি হেদায়েত অথবা ভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বান জানায়, হাদীস নং ২৬৭৪/১৬)*।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলেন, ''আমি জিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার উপাসনার জন্য সৃষ্টি করেছি '' (৫১/৫৬)। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষক হিসাবে যুগে যুগে নাবী ও রসূলদের প্রেরণ করেন। তাঁরা মানুযের কল্যানার্থে দ্বীনের বিষয়াদি যথাযথ বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হন। সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)ও এ বিষয়ে কোনও ত্রুটি করেননি। প্রতিটি বিষয়ে নীতিমালা শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। বক্ষমান হাদীসে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মনুষ্য সমাজকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুরক্ষিত রাখতে উপহার দিয়েছেন যে নীতি তা মহান আল্লাহ্‌র অর্থবহ এক সংক্ষিপ্ত বাক্যের বিশ্লেষণ হল মহানাবীর এ হাদীস। মহান আল্লাহ্ বলেন —

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهٗ نَصِيْبٌ مِنْهَا وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهٗ كِفْلٌ مِنْهَا وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُقِيْتًا.

''কেউ কোনো ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান'' (৪/৮৫)।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ ও এ হাদীসের সমার্থবোধক কয়েকটি হাদীসের মধ্যে দু-চারটির অনুবাদ প্রাসঙ্গিক মনে করছি —

১। যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম সুন্নাত চালু করে, অতঃপর তার উপর আমল হয়, এ সুন্নাতে আমলকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ মজুরী সুন্নাত চালু করা ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ করা হয়। তাদের মধ্যে মজুরীতে কোনো কমবেশি হয় না। যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ নীতি চালু করে ও পরবর্তীতে তার উপর আমল হয়। এ মন্দ নীতিতে আমল করা পরবর্তী ব্যক্তির সমপরিমাণ পাপ, নীতি চালু করা ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ করা হয়। তাদের পাপে কোনো ঘাটতি হয় না *(মুসলিম, অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি ভাল অথবা মন্দ পদ্ধতি চালু করে এবং যে ব্যক্তি হেদায়াত অথবা ভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বান জানায়, হাদীস নং ১৫)*।

২।''যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণকর নীতি চালু করে, অতঃপর পরবর্তীতে তার প্রতি আমল হয় ঐ ব্যক্তি এর পূর্ণ প্রতিদান পায় এবং এর উপর আমল করা ব্যক্তিদের প্রতিদান পায়, এদের প্রতিদানে কোনো ঘাটতি হয় না। যে ব্যক্তি কোনো মন্দ নীতি চালু করে এবং পরবর্তীতে তার উপর আমল করা হয়। ঐ ব্যক্তি এর পূর্ণ পাপ অর্জন করে এবং এর উপর আমল করা ব্যক্তিদের পাপ অর্জন করে। এদের পাপের কোনো ঘাটতি হয় না'' *(সুনানু ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি উত্তম অথবা মন্দ নীতি চালু করে, হাদীস নং ২০৪, হাদীস সহীহ্)*।

মহানাবীর উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট যে, কোনো মানুষ যদি হেদায়াত তথা কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানায়, তবে এ কল্যাণের প্রতিফল শুধু কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কল্যাণকর্মের প্রতিফল সম্পাদনকারী ব্যক্তি তো অর্জন করবেই, উপরন্তু ঐ কর্মের প্রতি আহ্বানকারী, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দাতারাও সমপরিমাণ প্রতিফল লাভ করবে। কোনো হেদায়াতের প্রতি আহ্বানের পর সেই আহ্বানের ধারা পরবর্তীতে কেয়ামাত পর্যন্ত যতদূর পৌঁছাবে এবং সেই ধারা অনুসরণ করে তার প্রতি যত জন আমল করবে, সকলের আমলের

সমপরিমাণ করে প্রতিদান আহ্বানকারী পাবে। একটি উত্তম কাজের প্রতিদান ১০ হলে কাজটি বাস্তবে আমলকারী ব্যক্তি প্রতিদান স্বরূপ ১০ পাবে এবং আমল না করেও আহ্বানকারী ব্যক্তি পথ দেখানোর জন্য ১০ পাবে। যদি আহ্বান বা পথ দেখানোর পর ঐ আহ্বানের ফলে একশ জন আমল করে, তবে একশ জনে নিজ আমলের জন্য ১০ করে প্রতিদান পাবে। অপরদিকে আহ্বানকারী ব্যক্তি একশ জনের সমপরিমাণ একশটি ১০ অর্থাৎ ১০x১০০=১০০০ (এক হাজার) প্রতিদান অর্জন করবে। এই শর্তে যে আমলকারীদের প্রতিদানে কোনও ঘাটতি করা হবে না। অর্থাৎ ১০ কে ভাগ করে ৫+৫ নয় বরং উভয়কেই ১০ করে প্রতিদান দেওয়া হবে।

ঠিক একইভাবে যদি কোনো ব্যক্তি ভ্রষ্টতা, বিপথগামীতা বা অকল্যাণের প্রতি কাউকে আহ্বান জানায়, উৎসাহ দেয় অথবা এর পথ উন্মোচন করে, তবে এর মাধ্যমে পরবর্তীতে যত জন মানুষ ঐ ভ্রষ্টতা ও অকল্যাণ কর্ম করবে, সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ আহ্বানকারী বা উৎসাহ দাতার ভাগ্যে জুটবে। এক্ষেত্রেও কারো পাপে কোনো ঘাটতি হবে না।

মহান আল্লাহ্, তাঁর ও মহানাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অমীয় বাণী দ্বারা - মানুষকে কল্যাণের প্রতি অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অনুপ্রেরণা দান করেছেন কল্যাণ প্রচার ও প্রসারে। নির্মূল করতে চেয়েছেন ভ্রষ্টতা ও মানবতা বিরোধী সকল ক্রিয়াকলাপকে। মানুষ যদি এ নীতি অনুসরণ করে কল্যাণের পথ সুগম করতে অগ্রসর হয় এবং পাপ, পঙ্কিলতার পথ হতে বিরত থাকে, তবে নিঃসন্দেহে মনুষ্য সমাজে বিরাজ করবে অনাবিল সুখ। বর্ষিত হবে স্বর্গীয় শান্তির ধারা।

কল্যাণ প্রচার ও প্রসার মাধ্যমের সাথে সকলের সরাসরি যুক্ত হওয়া উচিৎ। শারীরিকভাবে না পারলে মৌখিক বা আর্থিকভাবে সহযোগিতার মাধ্যমেও আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি। আমাদের অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা বাহ্যতঃ তুচ্ছ হলেও কেয়ামাত অবধি কী বিরাট আকার ধারণ করতে পারে তার হিসাব একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।

আমরা যদি অপকর্ম প্রচারের সাথে সরাসরি যুক্ত না হই তবুও খেয়াল রাখতে হবে অপকর্ম প্রচারের সাথে সামান্যতমও যেন লিংক না থাকে। হতে পারে এ লিংকের ফলেই আমরা হয়ে যেতে পারি অপকর্ম প্রচারের মাধ্যম। যার পরিণতি কিয়ামাত পর্যন্ত যে বিশাল আকার ধারণ করবে তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। প্রথম মানব হত্যাকারী কাবিল মাত্র একজন মানুষ সহোদর ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করে ছিল। যেহেতু সে এ অন্যায়ের প্রথম পথ প্রদর্শক ছিল, তাই কেয়ামাত অবধি যত মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে সকল হত্যার পাপের একটা ভাগিদার কাবিলও হবে *(বুখারী, অধ্যায় ঃ আদম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সন্তানাদির সৃষ্টি, হাদীস নং ৩৩৩৫, মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৭, অধ্যায় ঃ হত্যা প্রবর্তকের অপরাধ)*।

কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি আহ্বানের বর্তমানে সব থেকে সহজ মাধ্যম হল স্মার্টফোন। যা প্রায় সকলের হাতের মুঠোয়। আনলিমিটেড কল ফেসিলিটি অর্জন করতে গিয়ে ডেলি আনলিমিটেড ডাটা অর্জিত হচ্ছে। এর ফলে যুব সমাজ তো বটেই বয়স্ক ও শিশুরাও দিশেহারা। বুঝে না বুঝে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সকলেই 'হোয়াট্স অ্যাপ' ইমো, ফেসবুক, অ্যাকাউন্টে ব্যস্ত। জাতি কল্যাণ বা ব্যক্তি কল্যাণের প্রচার - প্রসার অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু দু-চারটি বাদে প্রায় সকল ম্যাসেজ ও আপলোড অনর্থক বা অকল্যাণকর। এ সকল বিষয় হয় মানুষকে অপকর্মের বার্তা দিচ্ছে নতুবা সময় অপচয় করতে বাধ্য করছে। প্রতিটি ম্যাসেজ ফরওয়ার্ড বা আপলোডের পূর্বে আমাদের ভেবে দেখা দরকার — এ ম্যাসেজ অপরের কল্যাণে কতুটুকু সহায়ক। যদি মানব কল্যাণে সহায়ক হয় তবে অবশ্যই এ আদান প্রদান পরকালের জন্য পাহাড়সম উত্তম প্রতিদানে রূপান্তরিত হবে। আর যদি অনর্থক বা অকল্যাণের হয়, তবে পরকালে পাহাড়সম পাপে রূপান্তরিত হবে। বাহ্যতঃ দেখতে একটি ম্যাসেজ, এক মিনিটের ভিডিও, কিন্তু এ ম্যাসেজ পর্যায়ক্রমে কতদিন ধরে, কতজনের কাছে যাবে তার হিসেব দিতে আমরা সকলেই অক্ষম। এর পরিণাম ও পরিণতি একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। কাজেই প্রতিটি ম্যাসেজ অন্যের কাছে ফরওয়ার্ডের পূর্বে, ফেসবুকে আপলোডের পূর্বে, অন্যের ম্যাসেজ লাইক-শেয়ার করার পূর্বে আসুন আমরা সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে দেখে নিই। যদি স্পষ্ট অকল্যাণ বা অনর্থক হয় একদম পরিহার করি। দ্যোদুল্যমান হলেও পরিহার করি। যদি স্পষ্ট কল্যাণকর হয় তবেই লাইক, শেয়ার, আপলোড বা অন্যের কাছে ফরওয়ার্ড করি। আমাদের হাতে 'ইন্টারনেট ডাটা' আয়ত্ব হওয়াতে ভাবনা চিন্তা না করে আমরা এসব কাজ করছি। মনে করছি 'ফ্রী' পরিষেবা ভোগ করতে অসুবিধা কোথায়? নিঃসন্দেহে আমাদের এ ভাবনা ভুল। আমরা এর মাধ্যমে কল্যাণ অকল্যাণের প্রতি আহ্বানে হয়ে যাচ্ছি। ভাগিদার হচ্ছি অজানা পরিমাণ প্রতিদান বা পাপের।

পরিশেষে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা - হে আল্লাহ্! তোমার হেদায়েতের প্রতি আমাদেরকে অবিচল রাখো এবং এর প্রতি আহ্বানের তাওফীক দাও। আমাদেরকে অকল্যাণ, অপকর্ম এবং তার প্রতি আহ্বান করা হতে মুক্ত রাখো — আমীন।

৩৬ পর্ব

كتاب الصلاة ❶

স্বলাতের মাসায়েল

স্বলাতের সময়সূচী - بَابُ اَوْقَاتِ الصَّلاَةِ

যোহরের প্রারম্ভিক সময় সূর্য ঢলে গেলে শুরু হয় ❷	اَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ الزَّوَالُ

❶ **শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ** স্বলাতের অর্থ হল দুআ, নামায, তাসবীহ, রহমত ইত্যাদি। صَلّٰى - يُصَلِّى অর্থাৎ বাবে তাফঈলের মাসদার থেকে مُصَلّٰى অর্থাৎ জায়নামায শব্দের উৎপত্তি। এর বহুবচন হল صَلَوَاتٌ।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ এমন একটি বহুল পরিচিত ইবাদাতের নাম যাতে রুকু এবং সাজদা থাকে, যা তাকবীর দিয়ে শুরু হয় এবং সালামের সঙ্গে সমাপ্ত হয়।[২]

মাশরুইয়্যাত বা শারয়ী হুকুম ঃ স্বলাতের শারয়ী হুকুমের দলীলসমূহ নীচে বর্ণিত হল — (ক)

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ - البينه : ٥

তাদের কেবল এটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যই দ্বীনকে বিশুদ্ধ করবে, স্বলাত প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত প্রদান করবে (সূরাহ্ আল্ বাইয়েনাহ্ ঃ ৫)।

(খ) وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ স্বলাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (সূরা রূম ৩১)।

(গ) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ اِقَامِ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ (ক) সাক্ষ্য দেওয়া এই মর্মে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও মাবূদ নাই এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল। (খ) স্বলাত প্রতিষ্ঠিত করা, (গ) যাকাত দেওয়া, (ঘ) হজ্জ করা এবং (ঙ) রমাযানের সিয়াম পালন করা।[৩]

১। আল কামূসুল মুহতী পৃঃ ১১৭৩, আল্ মুনজিদ পৃঃ ৪৭৯।
২। আনীসুল ফুকাহা পৃঃ ৬৭, আল্ কামূসুল মুহীত পৃঃ ১১৭৩, আল্ ফিক্‌হুল ইসলামী অ আদিল্লাতিহি ১/৬৫৩।
৩। বুখারী ৮ কিতাবুল ঈমান ঃ বাবু বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬৯, নাসায়ী ৮/১০৭, আহমাদ ২/১২০, হুমাইদী ৭০৩, ইবনু খুযাইমা ৩০৮, আবূ ইয়ালা ৫৭৮৮, ইবনু হিব্বান ১৫৮, বাইহাক্বী ৪/৮১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১/৬৪।

(ঘ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, মিরাযের রাতে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর ৫০ ওয়াক্ত স্বলাত ফরয করা হল। অতঃপর কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হল এবং ঘোষণা দেওয়া হল —

يَا مُحَمَّدُ ! اِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَ اَنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسُ خَمْسِيْنَ.

হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয় আমার নিকটে কথার পরিবর্তন করা হয় না এবং তোমাদের জন্য এ পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত স্বলাতের (সওয়াবের) সমান।[১]

(ঙ) তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন লোক আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! اَخْبِرْنِى مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ. আপনি আমাকে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা আমার উপর স্বলাতের কতটুকু ফরয করেছেন? উত্তরে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয স্বলাত। তাছাড়া তুমি নফল স্বলাতও আদায় করতে পার।[২]

স্বলাত পরিত্যাগকারীর শারয়ী বিধান

ইসলামী আরকানের মধ্যে নিঃসন্দেহে স্বলাতের মহান মর্যাদা রয়েছে। এটি দ্বীনের স্তম্ভ। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বর্ণিত বহু হাদীসে এর ফযিলত ও তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। স্বলাতের এই তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন প্রায় ৮০ বার স্বলাতের উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই স্বলাতের ওয়াজেব হওয়াকে অস্বীকার করে যে স্বলাত পরিত্যাগ করবে, সে সকলের ঐক্যমতে কাফির। তবে স্বলাতের ওয়াজেব হওয়াকে বিশ্বাস করে অলসতা করে যে স্বলাত পরিত্যাগ করবে, তার শারয়ী হুকুম কী এ বিষয়ে ফকীহদের মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তুলনামূলক সঠিক কথা হল এই যে, জেনেশুনে স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির। এর দলীল নীচে বর্ণিত হল— (ক) মুশরিকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র ঘোষণা —

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

যদি তারা তাওবা করে নেয়, স্বলাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই (সূরাহ্ তওবাহ, আয়াত নং ১১)।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, যদি তাওবা না করে স্বলাত আদায় না করে, তাহলে সে দ্বীনি ভাই নয়। আর দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব ইসলামী গন্ডির বাইরে গেলেই নষ্ট হয়ে যায়।

(খ) وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ স্বলাত সম্পাদন কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এ আয়াতের অর্থ হল, যে স্বলাত পরিত্যাগ করে নিশ্চয় সে মুশরিক (সূরাহ্ রূম, আয়াত নং ৩১)।

১। সহীহ্ঃ সহীহ্ তিরমিযী ১৭৬, কিতাবুস স্বলাতঃ বাবু কাম ফারাযাল্লাহ্ আলা ইবাদিহি মিনাস্ সলাওয়াত, তিরমিযী ২১৩, নাসায়ী ১/২২১, আহমাদ ৩/১৬১।

২। মুআত্তা ১/১৭৫, কিতাবু নিদা স্বলাতঃ বাবু জামেইত তারগীব ফিস স্বলাত, বুখারী ৪৬, মুসলিম ১১, আবূ দাউদ ৩৯১, আহমাদ ১/১৬২, নাসায়ী ১/২২৬, বাইহাক্বী ১/৩৬১, আবূ আওয়ানাহ্ ১/৩১০, মুশকিলুল আসার ১/৩৫৬।

(গ) জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاةِ. কুফর ও শির্ক এবং মানুষের (অর্থাৎ মুসলিম) মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হল স্বলাত।[১]

(ঘ) সওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْاِيْمَانِ الصَلوٰةُ فَاِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ. বান্দা এবং কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হল স্বলাত। যখন বান্দা স্বলাত পরিত্যাগ করবে, তখন সে শির্ক করবে।[২]

(ঙ) বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

اَلْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلوٰةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে সন্ধি হল স্বলাত, যে স্বলাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল।[৩]

(চ) আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

وَ لَا تَتْرُكْ صَلوٰةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. জেনে শুনে ফরয স্বলাত পরিত্যাগ করো না। যে জেনে শুনে স্বলাত পরিত্যাগ করল, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল।[৪]

(ছ) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَ بُرْهَانًا وَ نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَ لَا بُرْهَانًا وَ لَا نَجَاةً وَ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ اُبَىِّ بِنْ خَلَفٍ.

যে ব্যক্তি স্বলাতের হেফাজত করবে কিয়ামতের দিন এ স্বলাত তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও পরিত্রাণের কারণ হবে। আর যে স্বলাতের হেফাজত করবে না, তার জন্য স্বলাত জ্যোতি, দলীল ও পরিত্রাণের কারণ হবে না। বরং সে কিয়ামতের দিন কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালফের সঙ্গে থাকবে।[৫]

১। মুসলিম ৮২ কিতাবুল ঈমান বাবু বায়ানে ইতলাকে ইসমিল কুফরে আলা মান তারাকাস্ স্বলাত, আহমাদ ৩/৩৭০, দারেমী ১/২৬০, আবূ দাউদ ৪৬৭৮, তিরমিযী ২৬১৮, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৮, আল্ হিলিয়্যাতু লেআবী নুয়াইম ৮/২৫৬, বাইহাক্বী ৩/৩৬৬।

২। সহীহ্ ঃ শারহু উসুলে ইতিকাদে আহলিস সুন্নাতে অল জামাআতে লিল আলকায়ী ৪/৮২২, এর সনদ সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্ এবং ইমাম মুনযিরীও সনদটিকে সহীহ্ বলেছেন - আত্ তারগীব অত্ তারহীব ১/৩৭৯।

৩। সহীহ্ ঃ সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ ৮৮৪, আল্ মিশকাত ৫৭৪, তিরমিযী ২৬২১, কিতাবুল ঈমান ঃ বাবু মা জাআ ফী তারকিস স্বলাত, আহমাদ ৫/৩৪৬, নাসায়ী ১/২৩১, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৯, হাকিম ১/৬, ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪, দারাকুতনী ২/৫২, বাইহাক্বী ৩/৩৬৬।

৪। হাসান ঃ আল্ মিশ্কাত ৫৮০, ইবনু মাজাহ্ ৪০৩৪, কিতাবুল ফিতান ঃ বাবুস সাবরে আলাল বালা।

৫। জাইইদ ঃ আহমাদ ২/১৬৯, দারেমী ২/৩০১, মাজমাউল বাহরাইন ৫২৮, মাওয়ারেদ ২৫৪, মুশকিলুল আসার ৪/২২৯, শাইখ আলবানী (রহঃ) লিখেছেন যে, ইমাম মুনযিরী রহঃ এ হাদীসের সনদকে সহীহ্ বলেছেন - মিশকাত ৫৭৮।

(জ) আব্দুল্লাহ্ বিন শাকীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে,

كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلٰوةِ.

আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবাবর্গ স্বলাত ব্যতীত কোনো আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।[১]

(ঝ) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন — لَا حَظَّ فِى الْاِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ. স্বলাত পরিত্যাগকারীর ইসলামে কোনোও অংশ নাই।[২]

(জমহুর, মালেক, শাফেয়ী রহঃ) ঃ স্বলাতের ওয়াজেব হওয়াকে বিশ্বাস করে যদি অলসতা ও শিথিলতা বশতঃ স্বলাত পরিত্যাগ করে তাহলে কাফির হবে না, বরং ফাসিক হবে। যদি সে তাওবা করে নেয় তাহলে ঠিক আছে, না করলে বিবাহিত ব্যাভিচারীর ন্যায় তাকে শাস্তি স্বরূপ হত্যা করতে হবে এবং তাকে তালোওয়ার দিয়ে হত্যা করতে হবে।

(আহনাফ) ঃ এ ধরণের লোক কাফিরও হবে না এবং তাকে হত্যাও করা যাবে না। বরং শিক্ষা দেওয়ার জন্য সামান্য শাস্তি দিতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত সে স্বলাত সম্পাদন করা শুরু না করবে, ততদিন তাকে জেলখানায় আটকে রাখতে হবে।

(আহমাদ রহঃ) ঃ স্বলাত পরিত্যাগকারীকে তার কুফরীর কারণে হত্যা করতে হবে।[৩]

রাজেহ ঃ জেনে শুনে চিরস্থায়ীভাবে স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির এবং যদি ক্ষমতা থাকে তাকে হত্যা করে দিতে হবে। এর দলীল নীচে বর্ণিত হল —

(ক) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ يُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْا الزَّكَاةَ.

আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকব, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মাবূদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল, তারা স্বলাত সম্পাদন করবে এবং যাকাত দিবে।[৪]

(খ) এই হাদীসের নিরিখেই আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করেছিলেন।[৫]

(শওকানী রহঃ) - হক কথা হল এই যে, স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির এবং হত্যার যোগ্য।[৬]

১। সহীহ্ ঃ আল্ মিশকাত ৫৭৯, তিরমিযী ২৬২২, কিতাবুল ঈমান ঃ বাবু মা জাআ ফী তারকিস স্বলাত, হাকিম ১/৭।

২। মুআত্তা ৭৪, কিতাবুত তাহারাত ঃ বাবুল আমালে ফীমান গালাবাহুদ্ দামু মিন জারহিন আওরিয়াফিন।

৩। আল উম্ম ১/৪২৪, আল হাবী ২/৫২৫, রাওযাতুত তালেবীন ১/৬৬৮, আল আসল ১/৪০০, আল খারশী আলা মুখতাসার সাইইদী খালীল ২/১৩৮, আল মুগনী ৩/৩৫১, আল ইনসাফ ফী মারেফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ১/৪০১, আল্ কাওয়ানীনুল ফিকাইয়্যাহ্ পৃঃ ৪২, বিদায়াতুন মুজতাহিদ ১/৮৭, আশ্ শারহুস সাগীর ১/২৩৮, মুগনিল মুহতাজ ১/৩২৭, আল্ মুহায্যাব ১/৫১, কাশ্শাফুল কানা ১/২৬৩, আদ্ দুররুল মুখতার ১/৩২৬, মারাকাল ফালাহ্ পৃঃ ৬০।

৪। বুখারী ২৫, কিতাবুল ঈমান ঃ বাবু ফাইন তাবু অ আকামুস স্বলাত অ আতাউয যাকাত .. মুসলিম ২২, দারাকুতনী ১/২৩২, বাইহাক্বী ৩/৯২, ইবনু হিব্বান ১৭৪, হাকিম ১/৩৮৭, দারাকুতনী ১/২৩১, শারহু মাআনিল আসার ৩/২১৩, আহমাদ ২/৩৪৫, ইবনু মাজাহ্ ৩৯২৭।

৫। নাসায়ী ৭-৭৬, আবূ ইয়ালা ৬৮, ইবনু খুযাইমা ২৪৪৭, হাকিম ১/৩৬৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৩০।

৬। নাইলুল আওতার ১/৪২৪।

(নওয়াবী) ঃ যদি কোনো মানুষ স্বলাত পরিত্যাগ করে, তাহলে তার এবং কুফরের মধ্যে কোনও পর্দা অবশিষ্ট থাকল না।[১]

(শানকীতি) ঃ স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির।[২]

(আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহঃ) - বেনামাযী এবং কাফির সমান।[৩]

(ইবনু তাইমিয়া রহঃ) - যে ব্যক্তি স্বলাত পরিত্যাগ করে, অতঃপর বরাবর স্বলাত পরিত্যাগ করতেই থাকে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে কাফির হয়ে মারা গেল।[৪]

(ইবনু কাইইম রহঃ) - স্বলাতের ওয়াজেবে বিশ্বাসী স্বলাত পরিত্যাগকারীকে যারা কাফির মনে করে না, তাদের জন্য আশ্চর্য হয়েছেন।[৫]

(শাইখ উসাইমিন রহঃ) - বেনামাযী কাফির।[৬]

(শাইখ ইবনু জিবরীন) - যে জেনে শুনে স্বলাত পরিত্যাগ করবে, তার উপর কুফরির ফাতাওয়া লাগানো হবে।[৭]

(সউদী মাজলিসে ইফতা) - যে ব্যক্তি অলসতা ও শিথিলতা করে কোনও শারয়ী অজুহাত ছাড়া জেনেশুনে স্বলাত পরিত্যাগ করবে — এ বিষয়ে আলেমদের সব থেকে সঠিক কথা হল এই যে, সেই ব্যক্তি কাফির।[৮]

১। শারহু মুসলিম লিন নওয়াবী ৪/১৭৮।
২। আযওয়াউল বায়ান ৪/১১৩।
৩। তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ৭/৪০৭।
৪। আস্ সারেমুল মাসলুল ৫৫৪, মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/৯৭।
৫। কিতাবুস স্বলাত পৃঃ ৬২।
৬। রেসালাহ ঃ হুকমু তারিকিস স্বলাত।
৭। আল্ ফাতাওয়া আল ইসলামিয়া ১/২৯৬।
৮। আল ফাতাওয়া আল্ ইসলামিয়া ১/৩১১-৩১২।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যে সমস্ত লেখক / লেখিকাগণ 'সরল পথ' পত্রিকায় লেখা পাঠাতে চান তাঁরা এই ই-মেল sfprintersbld@gmail.com এ লেখা পাঠিয়ে এই 9434531957 নম্বরে অবশ্যই ফোন করে জানাবেন।

শেষ পর্ব

নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসায় সীমালংঘন এবং প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদানে ওলামাদের প্রয়াস

তাজাম্মুল হক সালাফী

ইমামরা গায়েব জানেন ঃ ইসনা আশারিয়া শিয়ারা দাবী করে যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য ইমামরাও গায়েব জানেন। এভাবে তারা তাদের ইমামকে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর থেকেও উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর জবাব দিতে পারতেন আবার কখনো তিনি বলতেন ঃ আমি জানি না। যেমন তাঁকে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন — জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাকারীর থেকে বেশি জানে না (মুত্তাফিকুন আলাইহি)। রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি এর জ্ঞান আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে দেন (১৭/৫৮)। আল্লাহ্ তাআলাও জানিয়ে দেন যে, তাঁর নাবী গায়েবের জ্ঞান জানেন না (৪৬/৯)। এরপরেও তারা কী করে বলে যে, ইমামরা গায়েবের জ্ঞান রাখেন। একবার কালব গোত্রের এক লোক আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করেন - হে আমীরুল মুমিনীন আপনাকে কি গায়েবের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে? তিনি হেসে বলেন ঃ না না তিনি জানেন না। বরং তিনি যা বলেন তা তো জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বলেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান হলো গায়েবের জ্ঞান। এগুলো একমাত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন। এগুলো ব্যতীত অন্যান্য বিষয় আল্লাহ্ তাঁর নাবীকে শিক্ষা দেন। আর তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে শিক্ষা দেন (নাহজুল বালাগা)।

ইমামরা রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের যোগ্য ঃ রাফেযী শিয়ারা সীমালংঘনে সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে তাদের ইমামদেরকে রুবুবিয়্যাত ও উলহিয়্যাতের আসনে বসিয়ে দিয়েছে। তারা মনে করে-ইমামরা গায়েব জানেন, পৃথিবীর কোনো কিছুই তাঁদের নিকটে গোপন নয়, তাঁরা মানুষের অন্তরের খবর জানেন, পুরুষের পৃষ্ঠদেশে কী রয়েছে তাঁরা তা জানেন এবং মায়ের গর্ভে কী আছে তাও তাঁরা জানেন, তাঁরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই জানেন। তারা আরো মনে করে যে সৃষ্টি জগতে ইমামদের সাবভৌম ক্ষমতা রয়েছে। তাঁরা মৃতকে জীবিত করতে পারেন, কুষ্ঠ ও ফুলপড়া রোগীদের আরোগ্য দিতে পারেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সব কিছুই ইমামদের অনুগত। এ ধরণের আরো অনেক ভ্রান্ত আকীদার কথা তাদের বইতে লেখা আছে। তারা তাদের এ আকীদা ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অসংখ্য হাদীস জাল করেছে। তাদের নিকটে সব থেকে সহীহ গ্রন্থ আলউসূল মিনাল কাফী'তে এ বিষয়ে অনেকগুলি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে আর প্রত্যেক অধ্যায়ে অনেকগুলি রেয়াওয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হাশেম বিন আবি আম্মার বলেন, ''আমি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি ঃ আমিই আল্লাহ্‌র চোখ, আমিই আল্লাহ্‌র হাত, আমিই আল্লাহ্‌র পার্শ্ব, আমিই আল্লাহ্‌র দরজা'' (বাসায়েরুদ দারাজাত ৮১, আরো দেখুন - কাফী লিল কালিনী ১/২৬১, আল্ ইহতেজাজ ১/৩৫৬)।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই তাদের এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেন। শাহারাসতানী বলেন, ''আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনিই কি মাবূদ? তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রেগে গিয়ে তাকে মাদইয়ান শহরে বিতাড়িত করলেন '' (আল্ মিলাল্ অন্ নিহাল ১/১৭৪)। বাগদাদী বলেন, ''আব্দুল্লাহ্ বিন সাবার দল সাবায়ী আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র বিষয়ে সীমালংঘন করে তাঁকে ইলাহ বা মাবূদ বানিয়ে নিল। এ খবর তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের একটি দলকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করেন (আল্ ফারুক বাইনাল ফিরাক ২৩৩)। যখন সাবায়ীদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন তারা হাসতে হাসতে বলল, ''এখন আমরা বুঝতে পারলাম সত্যিই আপনি আমাদের মাবূদ, কেননা আগুনের মালিক ব্যতীত কেউ আগুনের শাস্তি দিতে পারে না'' (আল্ বিদউ অত তারিখ ৫/১২৫)।

তাদের এ আকীদা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত বিধায় তা বাতিল। বাড়াবাড়ি করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, ''হে আহ্‌লে কিতাব! অনধিকারভাবে তোমরা তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে সীমালংঘন করো না'' (৫/৭৭)। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন, ''হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে সীমালংঘন করো না এবং আল্লাহ্‌র বিষয়ে সত্য ব্যতীত বলো না'' (৪/১৭১)। এই আয়াত দুটির ভাবার্থ হল এই

যে, আহ্‌লে কিতাবরা তাদের নাবী ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে নবুঅতের জায়গা থেকে উলুহিয়্যাতে উন্নীত করেছিল অর্থাৎ তাঁকে বান্দা থেকে মাবূদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাদের এ কাজ ছিল সত্যের অনুসরণে ও আনুগত্যে সীমালংঘন। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং তাদের এ কাজকে খণ্ডন করেছেন। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে শিয়া রাফেযীদের এ আকীদা সম্পূর্ণ বাতিল ও মনগড়া। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে মানুষের সামনে ঘোষণা করতে বলেছেন যে, তিনি ভালো মন্দের মালিক নন, গায়েব জানেন না এবং তিনি তো কেবল আল্লাহ্‌র অহীরই অনুসরণ করেন (দেখুন ৬/৫০, ৭/১৮৮)। আল্লাহ্ বলেন, ‘‘কেউই জানে না সে আগামী কাল কী করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে (৩১/৩৪)। সুতরাং শিয়াদের দাবী তাদের ইমামরা কখন মরবে, কোথায় মরবে সব জানে-একদম ভ্রান্ত ও কুরআনের বিরোধী আকীদা বিধায় তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন (৫১/৫৬) এবং নাবী ও রসূলদেরকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকটে পাঠিয়েছিলেন যেন তাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদাতের জন্য আহ্বান করেন (১৬/৩৬)। সুতরাং কুরআনের এ মৌলিক সূত্র অনুযায়ী আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এবং বাকী সমস্ত ইমামদেরকে মাবূদ বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁদের ইবাদাত করা হারাম ও বাতিল। বুখারীর রেয়াওয়াত শিয়াদের এ দাবীকে খণ্ডন করে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘তোমরা আমার বিষয়ে সীমালংঘন করো না যেমন খৃস্টানরা ইবনু মারইয়ামের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল। নিশ্চয় আমি তাঁর বান্দা, সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল বলো (বুখারী মাআল ফাতহ ৬/৪৭৮, হাদীস নং ৩১৮৯/৩৪৪৫)। নাবী ও রসূলগণ আল্লাহ্‌র বান্দা এবং কোনো মানুষই কখনো মাবূদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দলীল বিদ্যমান। জ্ঞান অন্বেষণকারীদের নিকটে তা স্পষ্ট।

ইমামরা কুদরতী ক্ষমতার মালিক ঃ শিয়ারা আহ্‌লে বাইতদের অন্ধভক্তির কারণে এমন এমন আজব কথা আবিষ্কার করেছে যা অকল্পনীয়। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের ইমামরা কুদরতি ক্ষমতার মালিক। সৃষ্টি জগতের সব কিছুই ইমামের অনুগত। তারা এ জন্য অসংখ্য হাদীস জাল করেছে। খুমাইনি বলেন, ‘‘নিশ্চয় ইমামের জন্য রয়েছে সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদা। তাঁর বিলায়াতের সামনে সকলেই অবনত হয় (আল্ হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ ১০৫)। তাদের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে তাদের ইমামরা এমন সব ইসমে আজমের মালিক যার মালিক নাবীরাও ছিলেন না। বরং তাঁদের যা রয়েছে তা আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে তার থেকেও বড়। কয়েকটি নমুনা নীচে উপস্থাপন করা হল ঃ

ক) ইসনা আশারিয়া শিয়া আলেম কাশানি এই মর্মে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র বরাতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হল এই রকম — একদিন মানুষ ভূমিকম্পের শিকার হয়েছিল। তারা আবূ বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র নিকটে ছুটে এসে দেখল যে, আবূ বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) উভয়েই ভয়ে তটস্থ হয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছেন। তাই লোকেরাও তাঁদের সঙ্গে আলী (আলাইহিস্ সালাম) এর দরজায় এসে হাজির হল। তিনি তাঁদের সামনে বেরিয়ে এলেন অথচ তাঁর উপর কোনো প্রকার ভয় ভীতির লেশ মাত্র ছিল না। তিনি একটি উঁচু জায়গার দিকে গেলেন। সবাই তাঁর পিছন পিছন গেলেন। তিনি সেখানে আসন গ্রহণ করলেন এবং বাকিরা তাঁর আসে পাশে বসে পড়লেন। সাহাবীরা সবাই দেখলেন যে, মদীনার দেওয়াল ভয়ে কাঁপছে। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘মনে হচ্ছে তোমরা যা দেখছ তাতে তোমরা সকলে ভীত সন্ত্রস্ত্র।’’ তারা বললেন, ‘‘আমরা কেন ভয় পাব না আমরা তো ইতিপূর্বে এ রকম দেখিনি?’’ তারপর তিনি তাঁর ঠোঁট নাড়লেন এবং তাঁর মুবারক হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করে বললেন কী হয়েছে তোমার? শান্ত হও, তখন শান্ত হয়ে গেল। তখন সকলে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা আমার কাজে অবাক হচ্ছো? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি হলাম সেই মানুষ যার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন —

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

ইনসান বলতে আমাকে বুঝানো হয়েছে। যে ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ কী হয়েছে তোমার? (তাফসীরুস সাফী পৃঃ ৫৭১)।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দুটি মেঘকে ইশারা করে ডাকলেন। মেঘ দুটি বিছানো কারপেটের ন্যায় এসে হাজির হল।

তিনি একটিতে চড়ে বসলেন আর অন্যটিতে তাঁর খাস সাথী সালমান ও মিকদাদ চড়লেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, '' পৃথিবীতে আমিই হলাম আল্লাহ্‌র চোখ, আমিই হলাম আল্লাহ্‌র জিহ্বা যা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে কথা বলে, আমিই হলাম আল্লাহ্‌র নূর যাঁকে নিভানো যায় না এবং আমি হলাম আল্লাহ্‌র দরজা যেখান থেকে প্রদান করা হয় এবং আমিই হলাম তাঁর দলীল, তাঁর বান্দাদের উপর (বেহারুল আনওয়ার ২৭/৩৪)।

এখন প্রশ্ন হল যদি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র এতটাই কুদরতী ক্ষমতা ছিল, তাহলে তিনি তার প্রয়োগ কেন করলেন না? তিনি আত্মরক্ষার জন্যও প্রয়োগ করতে পারতেন এবং দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও করতে পারতেন। তিনি আল্লাহ্‌র মনোনীত ইমাম হয়ে এবং এত ক্ষমতার মালিক হয়েও কেন দীর্ঘদিন আবু বাকর, উমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের মত কাফিরদের — তাদের ধারণা অনুযায়ী, তাবেদারী করলেন?

আবার হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেন নিজস্ব সেনা বাহিনী ও ইলাহী ক্ষমতা থাকা সত্বেও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র নিকটে আত্মসমর্পণ করলেন এবং একজন কাফির — তাদের ধারণা অনুযায়ী খলিফার আনুগত্য করলেন? আবার হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কারবালার প্রান্তরে সঙ্গী সাথীহীন অবস্থাতেও স্ত্রী পুত্র ও দ্বীন রক্ষার জন্যও ইলাহী অস্ত্রের ব্যবহার করলেন না? এরপরেও কি বলা যায় আল্লাহ্‌ তাআলা ইমামদের এ সব অস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ্‌ মিন যালিক)।

হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র কবর যিয়ারতে সীমালংঘন ঃ ইসনা আশারিয়া শিয়ারা এবং উপমহাদেশের বেরেলভী হানাফীরা হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র কবর যিয়ারতের নামে ইসলামী শরীআতের কবর যিয়ারতের বিধি বিধানের সীমালংঘন করেছে। আবুল কাসেম জাফর বিন মুহাম্মাদ এ বিষয়ে 'কামেলুয যিয়ারাত' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে অনেকগুলি অধ্যায় রচনা করেছেন। সেগুলি হল ঃ হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র কবরের যিয়ারত সমস্ত আমল থেকে উত্তম, যে ব্যক্তি হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র কবর যিয়ারত করল, সে আরশে আল্লাহ্‌র যিয়ারত করল, হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র কবর যিয়ারত করলে বয়স বৃদ্ধি পাবে, জীবিকায় বরকত হবে এবং যিয়ারত না করলে বয়স ও জীবিকা দুটোতেই ক্ষতি সাধিত হবে, হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) র কবরের যিয়ারত উমরা হিসাবে গণনা করা হবে এবং হজ্জের পরিবর্তন ধরা হবে ও গোলাম স্বাধীন করার সমতুল্য সওয়াব হাসিল হবে। ভারতীয় উপমহাদেশে মুহার্‌রম মাসে এই বিশ্বাসেই তাজিয়া বা হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র নকল কবর বের করা হয়। সাধারণ অবুঝ মুসলিমরাও নেকীর আশায় যিয়ারত করে এবং দান দাক্ষিণ্য করে। ১০ই মুহার্‌রম হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে মাতম করে এবং ইয়াজিদকে গালাগালি দেয়।

হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র কবর যিয়ারতের ফযিলত সম্পর্কিত সমস্ত হাদীস শিয়াদের বানানো ও জাল। ইসলামে কবর যিয়ারত করার জন্য তাগিদ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল আখেরাতের স্মরণ। তাই বলে কবরে সাজদা করা বা কবর যিয়ারত করলে উল্লিখিত সওয়াবের কথা কোনো বিশুদ্ধ হাদীসে নেই। ইসলামে কবর যিয়ারত করার অনুমতি আছে কিন্তু কবরকে আস্তানা বানানোর নির্দেশ নেই। বরং তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'ইহুদি ও খৃস্টানদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক, তারা নাবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে'' (বুখারী ৪১৭)। ইসলামে কারো জন্ম দিন বা মৃত্যু দিন পালন করা এবং মৃত্যুর জন্য মাতম করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু)র কবর যিয়ারত ও শোক পালন করা সম্পর্কিত শিয়াদের ও উপমহাদেশের বেরেলভী হানাফীদের আকীদা ও আমল বাতিল।

কারবালা কাবার থেকেও উত্তম ঃ নাবী পরিবারের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে গিয়ে নামধারী একদল মুসলিম কারবালাকে কাবার থেকে উত্তম করে দিয়েছে। যেহেতু কারবালাতে হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হয়েছিলেন, তাই তারা কারবালাকে কাবার থেকে উত্তম মনে করে। আর এ জন্য তারা নিজেদের মত করে মনগড়া হাদীসও রচনা করেছে। তারা আলী বিন হোসাইনের বরাতে একটি মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছে। সেটি হল এই যে আল্লাহ্‌ তাআলা কারাবালার ভূমিকে কাবা সৃষ্টির ২৪ হাজার বছর পূর্বেই হারাম, নিরাপদ ও বরকতময় করে সৃষ্টি করেছেন (বেহারুল আনওয়ার ১০৭/১০১, উসুলুশ শিয়াআতিল ইমামিয়্যাহ ২/৪৬৩-৪৬৪)। কুরআন হাদীসের কোথাও কারবালা ও এ স্থানের ফযিলতের বিবরণ নেই। সুতরাং তাদের দাবী বাতিল। বরং কুরআন-হাদীসে ও রসূলের আমল থেকে কাবার ফযিলত ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কাবার ইতিহাসও মুসলিমদের অত্যন্ত

স্মরণীয়। আল্লাহ্ বলেন, ''পৃথিবীতে ইবাদাতের জন্য প্রথম গৃহ নির্মিত হয়েছিল মক্কায়'' (৩/৯৬)।

সাহাবীদের গালী প্রদান ঃ ইসনা আশারিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা নাবী পরিবারের প্রতি অন্ধ ভক্তি ও ভালোবাসা দেখানোর নামে গুটি কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত প্রায় সকল সাহাবায়ে কেরামদেরকে ধোঁকাবাজ, কাফির ইত্যাদি নামে অবিহিত করে থাকে। তারা মনে করে যে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতীত সকল সাহাবাই মুরতাদ (আল্ কাফী ২/২৪৪)। অথচ আহ্‌লে সুন্নাত ও অল জামাআতের অনুসারীরা সাধারণতঃ সমস্ত সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দেরকে আম্বিয়াদের পরে সব থেকে উত্তম মানুষ মনে করেন। আর বিশেষ করে আবূ বকর, উমার, উসমান এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দেরকে। এর দলীল কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করেছেন (৯/৪০, ৩৩/৬, ২/১৩৭, ৪৮/২৯)। হাদীসে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে সমস্ত সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ন্যায়রপরায়ণ (সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ ১৩৭২)। এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি কুরআনী আয়াত ও হাদীস পেশ করা হল। এছাড়া আরো অনেক হাদীস ও কুরআনী আয়াত রয়েছে যা সাহাবাদের ফযিলত বর্ণনা করে। বিবেক বুদ্ধিও তাই বলে। কারণ পৃথিবীর সেরা প্রতিষ্ঠানে তাঁরা পালিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। যেখানের প্রশিক্ষক হলেন স্বয়ং রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং যাঁর অভিভাবক হলেন মহান রব্বুল আলামীন। আর বাস্তবেও তাঁদের সততা, ঐক্য ও বীরত্ব প্রমাণিত কেননা তাঁরা খুব অল্প সময়ে পৃথিবীতে তাঁদের বিজয় পতাকা উড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাকিয়্যা ঃ ইসনা আশারিয়া শিয়ারা নিজেদের মিথ্যা ও মনগড়া বিধি বিধানকে রক্ষা করার জন্য নানান ধরণের আশ্চর্য আশ্চর্য আকীদা বা বিশ্বাসের কথা প্রচার করে থাকে। তার একটি হল তাকিয়্যা অর্থাৎ সতর্কতা হিসাবে আত্মরক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা বলা। তারা হাদীস জাল করে কিন্তু নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকতে পারে না। তাদের কেউ ইমামের জন্য একরকম হাদীস জাল করে তো অন্যজন অন্যরকম হাদীস জাল করে, ফলে তাদের একজনের কথার সঙ্গে অন্যজনের কথা অমিল হয়। এ সমস্যা থেকে তাদের উত্তরণের একমাত্র পথ হল তাকিয়্যা অর্থাৎ ইমামের জন্য জেনে বুঝে মিথ্যা কথা বলাকে দ্বীনের অপরিহার্য অংশ নির্ধারণ করা। তারা এভাবে আহ্‌লে বাইতের নামে অসংখ্য হাদীস জাল করেছে। যেমন জাফর সাদিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''নিশ্চয় তাকিয়্যা দ্বীনের দশভাগের নয় ভাগ'(৯/১০) এবং যার মধ্যে তাকিয়্যা নেই, তার দ্বীন নেই।'' তিনি আরো বলেন, ''তাকিয়্যা আমার দ্বীন এবং আমার পিতার অর্থাৎ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র দ্বীন (আল্ কাফী, বাবুত তাকিয়্যা ২/২১৭)। এ মাযহাবের লোকেরা এ আকীদায় কেবল বিশ্বাসই করেনা বরং তারা তাকিয়্যাকে স্বলাতের মতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তাদের ওলামারা বিশ্বাস করে যে তাকিয়্যা বা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা হল ৯০ শতাংশ দ্বীন। এটি দ্বীনের অনুসারীদের জন্য ওয়াজেব। যে তাকিয়্যা পরিত্যাগ করবে সে সলাতের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি রূকনকে পরিত্যাগ করবে (আল্ ইতেকাদ ১১৪)। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে তাকিয়্যা কেবল একজন ইমামের দ্বীন নয় বরং সকল আহ্‌লে বাইতের দ্বীন এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তাদের বর্ণনা অনুযায়ী। বিবেকবান লোকেরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকিয়্যার পরিণতি নিয়ে পর্যালোচনা করে, তাহলে পরিস্কার বুঝতে পারবে যে, ইসনা আশারিয়া শিয়াদের আহ্‌লে বাইত সম্পর্কে এরকম ঘৃণ্য আকীদা কখনই নাবী পরিবারের সদস্যদের জন্য শোভনীয় নয়। নীচে তাকিয়্যার পরিণতি কী কী হতে পারে তার বিবরণ উপস্থাপন করা হল — (ক) তাকিয়্যাকে দ্বীন হিসাবে মেনে নিলে প্রমাণিত হবে যে আল্লাহ্‌র অবতারিত দ্বীন মিথ্যা দ্বীন। অথচ জাতি ধর্ম বর্ণ স্থান কাল পাত্র ভেদে মিথ্যা সকলের নিকটে একটি জঘন্য আচরণ (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক)। (খ) তাকিয়্যা যখন সকল আহ্‌লে বাইতের দ্বীন এবং তাকিয়্যা যখন দ্বীনের দশ ভাগের নয় ভাগ তখন কী করে আমরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর ভরসা রাখব যে, তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পরিপূর্ণভাবে রিসালাতের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। বরং তিনি কখনো কখনো তাকিয়্যাতান বা সতর্কতা হিসাবে কোনো বিষয়ে মিথ্যাও বলেছেন (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক)। (গ) তাকিয়্যাই যদি দ্বীনের অংশ হয় তাহলে ইমামের কী প্রয়োজন? ইমাম প্রেরণের উদ্দেশ্যই তো হল সত্য বাণী যথাযথভাবে মানুষের নিকটে পৌঁছে দেওয়া। ইমাম নিজেই যখন সত্য গোপন করবে এবং দ্বীনকে বরবাদ করবে নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য, তাহলে ইমামাতের কী গুরুত্ব রয়েছে?

তবে হ্যাঁ ইসলামী শরীআতে তাকিয়্যার বৈধ রূপ রয়েছে আর তা হল খওফ বা ভয়ের সময় আত্মরক্ষার তাগিদে মিথ্যা কথা বলা। মনে রাখতে হবে ইসলামে এটি ওয়াজেব নয়। বহু মুসলিম

এমনও আছেন জীবনে হয়ত কখনই এমন ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন না (এ বিষয়টি দেখার জন্য দেখুন - সূরাহ্ নাহল্ ১৬/১০৬ এবং সূরাহ্ আলে ইমরান ৩/২৮)।

রাজাআত ঃ ইসনা আশারিয়া শিয়াদের আলে বাইত সম্পর্কে অদ্ভুত আকীদাগুলির একটি হল রাজাআত। রাজাআত হল এই যে, আহ্লে বাইতরা ও হুক্কামরা কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের মাধ্যমে সেই সত্যকে বিজয়ী করবেন যা তাঁদের জীবনে বিজয়ী হয়নি এবং যারা সত্যের বিজয়ে বাধা দিয়েছিল তাদেরকে শাস্তি দিবেন। তারা মনে করে যে, যখন নাবী পরিবারের ইমামরা পুনরায় জীবিত হবেন, তখন সমস্ত নাবীরা তাঁদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করবেন। নাবী পরিবার সম্পর্কে শিয়াদের রাজাআত আকীদা আবিস্কারের মূল কারণ হল এই যে, তারা দাবী করেছিল যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর বংশধরদের কেউ কেউ ইমাম হয়ে উম্মাতের উপর হুকুমাত করবেন এবং তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবেন। কিন্তু বাস্তবে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কয়েক বছর হুকুমাত ব্যতীত কেউই হুকুমাত করার সুযোগই পাননি। তাই তারা তাদের এ লজ্জা ঢাকার জন্য এ আকীদা বা বিশ্বাসের কথা প্রচার করে।

রাজাআত প্রমাণ করার জন্য শিয়ারা কিছু কিছু অসার দলীল পেশ করে থাকে। যেমন (ক) আল্লাহ্ বলেন —

وَ حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ.

যে জনপদবাসীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের ফিরে আসাকে হারাম করে দিয়েছি (আম্বিয়া ২১/৯৫)। এই আয়াতটিই শিয়াদের নিকটে রাজাআতের সব থেকে বড় দলীল।

(খ) তাদের বর্ণিত রেয়াওয়াতের মধ্যে একটি হল জাফর বিন মুহাম্মদ সাদিক বলেছেন, ''যে ব্যক্তি আমাদের প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস করে না সে মুমিন নয় ......'' (মান লা ইয়াহযুরুল ফাকীহ ৩/৪৫৮)। তাদের উল্লিখিত আকীদার সপক্ষে পেশকৃত দলীল একদম গ্রহণযোগ্য নয় কারণ —

প্রথমত ঃ কুরআনে কোথাও একটিও এমন আয়াত খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা নাবী, রসূল ও মুমিনদের কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় ফিরে আসার বিবরণ দেয় (দেখুন ২৩/১৪-১৬, ৩১/৫৬, ৩/১৫৮, ২২/৬৯, ৪/১৪১)। কেবল ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে আল্লাহ্ আকাশে তুলে নিয়েছেন, তাঁকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন এবং তিনিও পুনরায় এসে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর শরীআত অনুযায়ীই কাজ করবেন। আর সূরা আম্বিয়ার ৯৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো তাফসীরকারকই ইমামাতের রাজাআতের ব্যাখ্যা করেননি। বিখ্যাত মুফাসসির ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী হারামুন এর অর্থ হল ওয়াজেব আর লা ইয়ারজেউন এর অর্থ হল লা ইয়াতুবুন এবং এ তাফসীরটিকেই ইবনু কাসীর রাজেহ বা উত্তম বলেছেন। **দ্বিতীয়ত ঃ** নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কিয়ামতের বিবরণ সংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে কিন্তু কোথাও এ বিষয়ে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। যেমন সহীহাইনে রয়েছে ঃ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির নিকটে সকাল সন্ধ্যা তার স্থান তার সামনে পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে তাকে জান্নাতবাসীদের জায়গা দেখানো হয় আর যদি সে জাহান্নামী হয় তাহলে তাকে জাহান্নামীদের স্থান দেখানো হয়। বলা হয় এটা তোমার জায়গা হবে, যখন তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন জীবিত করা হবে (বুখারী ১৩৭৯, মুসলিম ২৮৬৬)। এছাড়া এ মর্মে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোথাও কিয়ামতের পূর্বে জীবিত হওয়ার কোনো বিবরণ নেই। **তৃতীয়ত ঃ** কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও ঈমানের রুকন সমূহের মধ্যে যেমন স্বলাত, যাকাত, ফেরেশতা, কিতাব, নাবী, রসূল, তাকদীর, বা'সু বাদাল মওত, মিসকীন, ফকীর ও আত্মীয়দের হক ইত্যাদির সঙ্গে রাজাআতকে গন্য করা হয় নি (দেখুন ২/১৭৭, মুসলিম ১০২, আবূ দাউদ ৪৬১৫)। **চতুর্থত ঃ** নাবী পরিবারের সদস্যরাই এ আকীদার খন্ডন করেছেন। যেমন আমর বিল আসাম বলেন, ''আমি হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করলাম ঃ শিয়ারা মনে করে যে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় জীবিত করা হবে। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! এরা মিথ্যা কথা বলছে (তাবাকাতু ইবনু সাআদ ৩/৩৯, তারিখ দামাস্ক ১৩/২৬০)।

আলে বাইতরা নিজেরাই তাঁদের সম্পর্কে সীমালংঘনের বিষয়গুলি খন্ডন করেছেন ঃ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুফার মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পরে আবু বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (আল আলকায়ী ৩/১৩৬৬-১৩৯৭)। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আবূ বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু

আনহুম)-দের থেকে কেউ আমাকে বড়ো করো না (আস্ সুন্নাহ্ লি ইবনে আবী আসেম পৃঃ ৫৬১)।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে কিয়ামতের পূর্বে প্রেরণ করা হবে - শিয়াদের এ আকীদা সম্পর্কে হাসান বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম এরা সব মিথ্যা বলেছে। এরা শিয়া নয়। যদি আমরা জানতাম তিনি প্রেরিত হবেন তাহলে আমরা তাঁর কন্যাদের বিবাহ দিতাম না এবং তাঁর সম্পদ বন্টন করতাম না (সিরাতু ইলামিন নুবালা ৩/২৬৩)।

হোসাইন বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইরাকের বাসিন্দা যারা তাঁকে ধোঁকা দিয়েছিল তাদের জন্য বদ্ দুআ করেছিলেন (সিরাতু ইলামিন নুবালা ৪/৩০২)।

আলী বিন হাসান বলেন, ''হে আহ্লে ইরাক! তোমরা আমাদেরকে ইসলামের ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসো। আমাদেরকে প্রতিমা বা মূর্তিকে ভালোবাসার মত ভালোবেসো না (সিরাতু ইলামিন নুবালা ৪/৩৯০)।

মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকির বলেন ঃ ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র বংশধররা সহমত যে, তাঁরা আবূ বাকর ও উমার সম্পর্কে যা বলবে তা উত্তম বলবে (সিরাতু ইলামিন নুবালা ৪/৪০৬)।

যায়েদ বিন আলী বলেন ঃ আবূ বকর হলেন কৃতজ্ঞদের ইমাম। অতঃপর তিনি তেলাওয়া করেন —

وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ.

তিনি আরো বলেন, আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বিমুখ হওয়া (শারহূ উসুলিল ইতেকাদে আহলিস সুন্নাহ ৭/১৩০২)।

জাফর বিন মুহাম্মদ (সাদেক) তাঁর অন্ধভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ যারা মনে করে যে আমি নিষ্পাপ ইমাম এবং আমার আনুগত্য ফরয, তাদের এ বিশ্বাস থেকে আমি মুক্ত (সিরাতু ইলামিন নুবালা ৬/২৫৯)। তিনি আরো বলেন, যারা আমাকে আবূ বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে পবিত্র মনে করে, আমি তাদের এ আকীদা থেকে মুক্ত।

উপসংহার ঃ নাবী পরিবারের প্রতি অতি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শনের পশ্চাতে ইহুদিদের চক্রান্ত সরলমনা ও দ্বীন প্রেমী মুসলিমরা কোনো দিনই বুঝতে পারেনি। ফলে আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা ইয়ামেনি ইহুদিদের মিশন সফল হয়েছে। আজও সাধারণ মানুষ অ ইসলামী কাজকর্মকে ইসলামী শরীআত মনে করে আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আমল করেই চলেছে। ইসলামের এ ফাটল কেবল ব্যক্তিগত স্তরেই শেষ নয় বরং তা আন্তর্জাতিক স্তরেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। আজ মধ্য প্রাচ্য তথা গোটা আরব দুনিয়া এ ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত। শিয়া মুসলিমরা আকীদাগত বিষয়ে সুন্নিদের একদম বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। ইসলাম শত্রুরা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম উম্মাহ্কে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে। আপস দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে নিজেদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আগামী শতাব্দীতেও হয়ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে কিনা যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস এবং নাবী পরিবারের প্রতি অতি ভক্তি ও অন্ধ ভালোবাসার বেড়াজাল থেকে মুক্তি দাও এবং ইহকাল ও পরকালে আমাদের সাফল্যমণ্ডিত কর — আমীন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। আল্ আকীদাতু ফী আহ্লিল বাইত বাইনাল ইফরাতে অত তাফরীত - সুলাইমান বিন সালিম।

২। হেওয়ারাতুন আকলিয়্যাহ মাআত তায়েফাতুল ইসনা আশারিয়্যাহ ফিল উসূল - আল্ গামেদী, আহমাদ বিন সাআদ হামদান।

৩। হুকুকু আহলিল বাইত - ইবনুল কাইইম।

৪। আশ্ শিয়াতু অল কুরআন - ইহসান ইলাহি যাহির।

৫। আল বুরহান ডট কম।

৬। ইসলাম ওয়েব ডট নেট।

৭। আর রাসায়েল ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।

৮। শাবকাতুদ দিফা আনিস সুন্নাহ / ডি ডি সুন্নাহ্ ডট নেট।

৯। শিয়াদের পরিচয় ও আকীদা এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস - নাদিম মাহদী।

১০। সংক্ষেপে শিয়াদের উৎপত্তি - দূর্গম গিরি।

৩য় পর্ব

নাবী যুগে নারীদের দাওয়াত কার্যের রূপরেখা

সম্পাদনা - ড. সুলাইমান বিন হাম্দ আল্ আওদাহ্
ভাষান্তর ঃ আব্দুল হালিম বুখারী

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী এবং সন্তান-সন্ততির সঙ্গে দাওয়াত

গৃহে তথা সন্তান-সন্ততির সঙ্গে নারীর দায়িত্ব বিশাল। সন্তান-সন্ততিকে দাওয়াত এবং তাদের প্রতিপালন হলো একটি সংগ্রাম। তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং এরই মধ্যে রয়েছে শরীআতের দাবি পূরণ, ''নারী হলো দায়িত্ববান এবং সে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে''।

মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে নারীরা তাদের সন্তান-সন্ততির সঙ্গে কীভাবে দাওয়াতি কার্য সম্পন্ন করতেন, যাঁরা সে বিষয়ে পর্যালোচনা করেন তাঁরা নিম্নোক্ত দাওয়াতি উদ্যোগগুলির প্রতি মনোনিবেশ করে থাকেন ঃ

১। তরুণ সমাজের প্রতিপালন ঃ ইসলামের অবস্থানে, উত্তম চরিত্র এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির উপর তরুণ সমাজের প্রতিপালন এমন একটি উদ্যোগ যা মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগের নারীগণ গ্রহণ করেছিলেন।

কে জানে না আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে? যিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সেবক এবং সুন্নাতের হাফিজ ছিলেন। কার নিকট এ কথা গোপন রয়েছে যে তাঁর মা কীভাবে তাঁকে লালনপালন করেছিলেন? বাল্যকাল থেকেই সন্তানের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল। তিনি তাঁকে শাহাদাতাইন পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন। তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ''বলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্; বলো, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্''; আর শিশু তাই করতেন। ফলে মুশরিক বাবা উত্তেজিত হয়ে বলতেন, ''তুমি আমার সামনে আমার ছেলেকে নষ্ট করো না''; শিক্ষিকা মা উত্তর দিতেন, ''আমি তাকে নষ্ট করছি না'' (আত্ তাবাকাত ৮/৪২৫)।

পুত্র আনাসের যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি বিবাহ পিছিয়ে দিয়েছিলেন। যখন আবু তালহা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, তিনি বলেছিলেন, ''যতদিন আনাস প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে সভায় আসীন হওয়ার উপযুক্ত না হয়ে যায় আমি বিবাহ করব না।'' তিনি বলতেন, ''আল্লাহ্ আমার মাকে উত্তম প্রতিদান দিন, তিনি আমার প্রতি উত্তম লালনপালন করেছেন'' (আত্ তাবাকাত্ ৮/৪২৬)।

প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মদীনায় হিজরত করলেন। ওই সময় আনাসের বয়স দশ বছর অতিক্রম করেনি। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সামনে পেশ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি তাঁর সেবা করবেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর চরিত্র হতে উপকৃত হবেন, মা যে শিক্ষা দিতে পারেননি সেই শিক্ষা সেখান থেকে গ্রহণ করবেন। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে গ্রহণ করলেন। তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দশ বছর সেবা করেন। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, যদিও বাদরিদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয় না, কারণ তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সেবক হিসাবে বেরিয়েছিলেন এবং তখনও যুদ্ধ করার বয়স তাঁর হয়নি (ইবনে হাজার, আল্ ইসাবা ১/১১৩)।

শিশুর অবিচলতা ও অধিক গুণাগুণ অভিনিবেশ করে তাঁর মা উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট বিশেষ করে আনাসের জন্য দুআ করার অনুরোধ করেছিলেন। এটা ওই সময়ের ঘটনা যখন তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁদের পরিদর্শনে এসে তাঁর ঘরে স্বলাত (নফল) আদায় করেছিলেন এবং উম্মে সুলাইম ও তাঁর পরিবারের জন্য দুআ করেছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার নিকট আমার একটি ছোট্টো প্রার্থনা আছে। তিনি বললেন, ''সেটা কী?'' তিনি বললেন, আপনার সেবক আনাস (যার জন্য আপনি দুআ করেছেন)। সুতরাং তাঁর জন্য পৃথিবী ও পরকালের সমস্ত কল্যাণের প্রার্থনা করলেন। অতঃপর বললেন, ''হে আল্লাহ্! তুমি তাকে অর্থ ও সন্তান দান করো এবং তাতে বরকত দাও।'' আনাস বলেন, ''আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে অর্থশালী ব্যক্তি আমি ছিলাম।'' আমার মেয়ে আমিনা আমাকে বলেছেন, ''বাস্রায় হাজ্জাজের আগমন পর্যন্ত তিনি আমার গর্ভের একশো ঊনত্রিশজন সন্তানকে দাফন করেছেন'' (আত্ তাবাকাত ৮/৪২৯)

হ্যাঁ, সন্তানের প্রতি মায়ের যত্ন যথার্থ পর্যায়ের ছিল। সন্তান সচেতন ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠেছিল উন্নত চরিত্রের উপর। তিনি

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হেদায়াতের নিকটতম ব্যক্তি ছিলেন। এমনকী আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘‘আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্বলাতের সঙ্গে উম্মে সুলাইমের পুত্র (আনাস) এর স্বলাতের যে মিল দেখেছি সেই মিল অন্য কারো স্বলাতে দেখিনি’’ (আল্ ইসাবা ১/১১৪)।

যেমন তিনি দ্বীনের ব্যাপারে অবিচল ছিলেন, দুনিয়া তাঁর জন্য অবিচল ছিল। পরবর্তীতে তিনি বিশাল দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয়ে উঠেছিলেন। শায়খায়ন (আবু বাকর ও উমার) এর স্তুতিবাদ তাঁর জন্য যথেষ্ট। একদা আবু বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আনাসকে ডেকে পাঠালেন তাঁকে গভর্ণর করে বাহ্‌রাইন পাঠানোর জন্য। তারপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিকটে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর নিকট পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, ‘‘তাঁকে পাঠিয়ে দিন, নিশ্চয় তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ও লেখক।’’ ফলে তাঁকে পাঠালেন (আল্ ইসাবা ১/১১৪)।

আনাসের ক্ষেত্রে এই উক্তি সত্য প্রমাণিত হয় যে, ‘‘প্রত্যেক মহান বিষয়ের পিছনে একজন নারীর হাত থাকে’’। .... চিন্তা করুন কীভাবে তাঁর মা তাঁর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের নেতার সেবা করার সুযোগ প্রাপ্তির এবং নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হয়েছিলেন।

সন্তানের প্রতি যত্নের আরেকটি নমুনা আসমা বিনতে আবু বাক্‌র এবং তাঁর সন্তান আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর। তিনি ছিলেন হিজরতের পর প্রথম মুসলিম শিশু এবং সাহসী সাহাবাবর্গের মধ্যে অন্যতম একজন। মক্কাতেই তাঁর মা তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। অতঃপর হিজরত সংঘটিত হলো। ওই সময় তিনি গর্ভবতী। সেই অবস্থাতেই তিনি সফরের কষ্ট সহ্য করেছিলেন — আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য হিজরতের পথে। যখন তিনি কুবায় পৌঁছোলেন তখন সেখানে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। অতঃপর তাঁকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে এলেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে নিজের কোলে বসালেন, অতঃপর একটি খেজুর চাইলেন এবং প্রথমে সেটিকে চিবালেন এবং আব্দুল্লাহ্‌র মুখে নিজের লালা দিলেন। অতএব সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর লালা তাঁর পেটে গেল। অতঃপর তিনি তাঁর উপর হাত বুলিয়ে তার জন্য দুআ করলেন। আর তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। তাঁর বয়স যখন সাত বা আট তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট বাইআত গ্রহণ করার জন্য হাজির হন। যুবাইর তাঁকে এর নির্দেশ দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন তাঁকে সামনে আসতে দেখলেন তখন মৃদু হাসি হাসলেন। অতঃপর তাঁকে বাইআত করালেন (মুসলিম, অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ, নবজাতকের তাহ্‌নিক করা এবং জন্মের পর কোনো সৎ লোকের নিকট নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব, হাঃ ২১৪৬)।

ইবনে যুবাইর বলেন, আমি ওই সময় হিজরত করি যখন আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম (আল্ ইসাবা ৬/৮৬)।

আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইরের লালন পালনের সুফল পাওয়া গিয়েছিল। যদিও তিনি বয়সের প্রেক্ষিতে শিশু সাহাবীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন, কিন্তু শিক্ষা, সম্মান, সংগ্রাম ও ইবাদতের প্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন মহান। যেমন যাহাবি উল্লেখ করেছেন (সিয়ারু আলামিন্ নুবালা ৩/৩৬৪), ‘‘তাঁকে হামামাতুল মাসজিদ (মসজিদের পায়রা) বলা হতো’’ (প্রাগুক্ত ৩/৩৬৭)। আধিপত্য ও কর্তৃত্ব তাঁর ইবাদতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আধিপত্য সত্বেও ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি একটি নমুনা ছিলেন (প্রাগুক্ত ৩/৩৬৮)।

মা আস্‌মা পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন ও দেখাশোনা করতে থাকেন। যখন তাঁর দিন শেষের দিকে ছিল তিনি তাঁকে উপদেশ দিতেন, ‘‘হে আমার বৎস! সম্মানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করো এবং সসম্মানে মৃত্যুবরণ করো, জাতি যেন তোমাকে বন্দী করতে না পারে’’ (সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৩/৩৯৩)।

বরং মা আস্‌মার যত্ন পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি অব্যাহত ছিল। এমনকী যখন তাঁর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছিল, তারপরও তিনি তাঁকে গোসল করিয়েছিলেন। আর যখন হাজ্জাজ তাঁর এই দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করেন তখন তিনি আব্দুল মালিক বিন মার্‌ওয়ানের নিকট দরখাস্ত করেন। তিনি এর অনুমতি দেন। ফলে তিনি তাঁকে মদীনায় উম্মুল মুমিনীন সাফিয়ার ঘরে দাফন করেন। তাঁর সমাধি মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সমাধির কাছাকাছিই রয়েছে (প্রাগুক্ত ৩/৩৭৯)।

মুসলিম নারীদের কি জানা আছে যে, মেধাসম্পন্ন মহিলা ও মহান মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র পিছনে আরেক মহান মা উম্মে রুমান রয়েছেন, যিনি তাঁকে লালিত-পালিত এবং ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেছিলেন। ইবনে সা’দ ওয়াকিদী হতে বর্ণনা করেছেন, যখন খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মৃত্যুবরণ করেন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিকট জিব্রাইল (আলাইহিস্ সালাম)

কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর নিকট কোলে করে আয়েশাকে নিয়ে এলেন এবং বললেন, ''হে আল্লাহ্‌র রসূল! এ আপনার কিছুটা দুঃখ লাঘব করবে এবং তার মধ্যে খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) র কিছু আচার-আচরণ রয়েছে।'' অতঃপর তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আবূ বাক্‌রের বাড়ি যাতায়াত করতেন এবং বলতেন, ''হে উম্মে রূমান! আয়েশার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করুন এবং তার ব্যাপারে আমাকে নিরাপত্তা দিন।'' এজন্যই পরিবারের নিকট আয়েশার বিশাল মর্যাদা ছিল, অথচ তাঁর বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ তাদের জানা ছিল না। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একদিন তাঁদের নিকটে যান আর আবু বাকরের ইসলাম গ্রহণ হতে হিজরত পর্যন্ত এমন দিন যায়নি যেদিন তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর বাড়ি যাননি। তিনি দেখছেন, আয়েশা আবু বাক্‌রের দরজায় চাদরাবৃত হয়ে দুঃখের কান্না কাঁদতেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন এবং বললেন, তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলো এবং তিনি উম্মে রূমানের নিকট গিয়ে বললেন, ''আমি কি তোমাকে আয়েশা ব্যাপারে উপদেশ দিইনি যে তুমি তার ব্যাপারে আমাকে হেফাজত করো?'' তিনি বললেন, ''হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! সে আমার বিরুদ্ধে সিদ্দীকের নিকট অভিযোগ করেছে এবং তাঁকে আমাদের উপর ক্রুদ্ধ করে তুলেছে''। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''যদিও সে এমন করে।'' উম্মে রূমান বললেন, ''ঠিক আছে, আমি আর কখনোই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করব না'' (ইবনে সা'দ, আত্ তাবাকাত ৮/৭৮-৭৯)।

২। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতিরক্ষা ঃ গভীর জ্ঞান ও সচেতনতার পরিচয় হলো যে, মা তার সন্তান- সন্ততির লালন-পালন এমনভাবে করবে যেন তারা মহানবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ভালোবাসা ও প্রতিরক্ষার শিক্ষা পায়। তাঁর প্রতিরক্ষাই হলো ইসলামের প্রতিরক্ষা। তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর আনুগত্যই হলো আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা। আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের জীবনীতে ইবনে সা'দ ওয়াকিদী হতে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, বাররাহ্ বিনতে আবু তিজরাহ্ বলেন, আবু জাহ্‌ল সহ কয়েকজন কাফির মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পথ অবরোধ করে তাঁকে জ্বালাতন করে। এই দেখে তুলাইব বিন উমাইর আবু জাহ্‌লের নিকট গিয়ে তাকে একটা কঠিন চপেটাঘাত করে। তারা তাকে ধরে বেঁধে দেয়। ফলে তার মামা আবু লাহব তার সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাকে মুক্ত করে। আর্‌ওয়াকে বলা হলো, তুমি কি তোমার ছেলে তুলাইবকে দেখছ না সে মুহাম্মাদের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে? তিনি বললেন, ''সেই দিন তার জন্য সর্বোত্তম যেদিন সে তার মামার ছেলের প্রতিরোধ করেছে এবং সে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতেই সত্য আনয়ন করেছে।'' তারা জিজ্ঞাসা করল, ''তুমি মুহাম্মাদের অনুগত হয়েছো?'' তিনি বললেন, ''হ্যাঁ'' (আত্ তাবাকাত ৮/৪২, ৪৩; ইবনে হাজার, 'আল্ ইসাবা' ১২/১০৯; তাঁর বর্ণনায় এসেছে, 'তার সর্বোত্তম সেইদিন যেদিন সে তার মামার ছেলেকে সাহায্য করেছে')।

ইবনে সা'দ বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন উমার ছাড়া অন্যদের উল্লেখ করতে শুনেছি যে, আর্‌ওয়া বলেছিলেন, ''যেদিন তুলাইব তার মামার ছেলেকে সাহায্য করেছে সেদিন তাঁর সঙ্গে সহমর্মিতা করেছে তার দায়িত্বে ও অর্থে'' (প্রাগুক্ত ৮/৪৩)।

এই হলো নারী কর্তৃক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতিরোধ ও যুব সমাজের সহায়তার দৃষ্টান্ত। আজ যখন মুস্তাফা (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর আক্রমণের হার বেড়ে চলেছে তখন আমরা প্রতিরোধ ও সহযোগিতার দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করছি, নারীদের সমসাময়িক নমুনাগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি যাঁরা নিজে মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহায্য করতেন এবং সর্বোত্তম সৃষ্টি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতিরক্ষার জন্য স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে বড়ো করে তুলতেন এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্য তাদেরকে উৎসর্গ করে দিতেন ....।

৩। অবিরত পর্যবেক্ষণ ও শাহাদাতের মূল্যায়ন ঃ তা লালন-পালন থেকে কঠিন নয়। সেটা শুধু কথিত কালেমা নয় এবং শুধুমাত্র নীতি গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং তা ধৈর্যধারণ ও কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং স্থায়ী পথ নির্দেশনা ও অনুসরণ। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন — وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

অর্থ ঃ তুমি তোমার পরিবারকে স্বলাতের আদেশ করো এবং তাতে ধৈর্যধারণ করো (সূরা ত্বহা ১৩২)। মা যদি কল্যাণের উপর সন্তান-সন্ততিকে প্রতিপালিত করতে সফল হয় তাহলে সেটা হবে একটা সাফল্য, কিন্তু সর্ববৃহৎ সাফল্য ওই সময় অর্জিত হবে যখন সত্যের উপর সন্তান-সন্ততির অবিচলতা অব্যাহত থাকবে,

কল্যাণের উপরেই অন্তিম সময়ে তাদের মৃত্যু হবে এবং আল্লাহ্র পথে তাদের শাহাদাতবরণের মূল্যায়ণ মা করবে (অবশ্য তা হবে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে ও ইচ্ছায়)। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে পিতামাতার যত্ন ও আগ্রহ এই ঐশী সৌভাগ্যের একটি অন্যতম মাধ্যম।

মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে যে সমস্ত নারী দায়ী বা আহ্বায়ক ছিলেন তাঁদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যুব সমাজের প্রতিপালনের প্রতি তাদের যত্নের পূর্বে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের পর্যবেক্ষণ ও তাদের পরিস্থিতি যাঁচাইয়ের কথা উল্লেখ করা হয়। এই অবস্থানই ছিল উম্মে রাবী' বিনতে বারার। তিনি হারিসা বিন সুরাকার মা ছিলেন। বদর যুদ্ধের দিন তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করেন, ''হে আল্লাহ্র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! আপনি হারিসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি?'' হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তিরের আঘাতে শাহাদাত লাভ করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্যধারণ করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরাম কাঁদতে থাকবো।' আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস পেয়ে গেছে'' (বুখারী, অধ্যায়ঃ আল্ জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, অনুচ্ছেদঃ অজ্ঞাত তির এসে যাকে হত্যা করে, প্রণিধান করুন আল্ ফাত্হ ৬/২৬, হা ২৮০৯)।

দেখুন আসমা বিনতে আবু বাক্রকে। তিনি অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইরের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। তিনি অত্যন্ত কষ্টে জর্জরিত ছিলেন, এমন সময় পুত্র আব্দুল্লাহ্ তাঁর পরিদর্শনে এসে তাঁকে বলেন, ''মৃত্যুর মধ্যেই রয়েছে সুস্থতা।'' তিনি উত্তরে বলেন, ''বোধ হয় তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছো, এমন করো না'', এবং তিনি হেসে বললেন, ''আল্লাহ্র শপথ, আমি মরতে চাই না যতক্ষণ না তোমার একটা কিনারা হয়ে যায়। হয় তুমি নিহত হবে আর আমি তোমার পূণ্যের আশা করব অথবা তুমি জয়ী হবে আর তাতে আমার চোখ জুড়িয়ে যাবে। সাবধান, তুমি এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করো না যা তোমার জন্য সমীচীন নয়, আর মৃত্যুর ভয়ে তা তুমি গ্রহণ করে ফেল'' (যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/২৯৩)।

শেষ পর্ব

আক্বীক্বার শারয়ী বিধান

হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী সালামী

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনের পর আক্বীক্বা করা

১। আক্বীক্বা দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, প্রত্যেক শিশু তার আক্বীকার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয় (আবূ দাউদ ২৮৩৮, ইবনে মাজাহ্ ৩১৬৫, মিশকাত ৪১৫৩)।

২। তিনি বলেন, সন্তানের সাথে আক্বীক্বা জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত কর (বুখারী ৫৪৭২, তিরমিযী ১৫১৫, মিশকাত ৪১৪৯)।

উক্ত দুই হাদীসে আক্বীকার গুরুত্ব ও সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার নাতী হাসান ও হুসাইনের আক্বীকাও সপ্তম দিনে করেছিলেন (সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৫৩১১, আবূ দাউদ ২৪৬৬)। অতএব সক্ষম ব্যক্তি সপ্তম দিনেই আক্বীকা করবে।

উল্লেখ্য সাত দিনের পরে ১৪ ও ২১ দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার ব্যাপারে বাইহাক্বীতে একটি মারফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তার রাবী (বর্ণনাকারী) দুর্বল।

এই রকম আরো একটি হাদীস আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে (মুসতাদারক হাকীম ৪/২৩৮, ২৩৯ পৃঃ)। কিন্তু এই হাদীসটি ইনক্বতার কারণে দুর্বল (ইরওয়াইল গালীল হাঃ ১১৭০)।

সঙ্গত কোনো কারণে যদি দেরি হয়

সঙ্গত কোনো কারণে যদি দেরি হয়, এই ব্যাপারে ফুকাহা এবং উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

১। কিছু ফুকাহার ধারণা যে যদি সপ্তম দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষ হতে আক্বীকা করা সুন্নাত নয় কেননা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সপ্তম দিনেই আক্বীকার সময় নির্ধারণ করেছেন (ফিকহুল হাদীস ২/৪৯৪ পৃঃ)।

২। সৌদী মাজলিস ইফতা ঃ হ্যাঁ সাত দিনের পরেও আক্বীকা যথেষ্ট, কিন্তু জন্মের সপ্তম দিন হতে দেরি করা সুন্নাতের

খেলাফ এবং প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যারা বাচ্চা অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের দ্বারা মুমিন পিতা-মাতার উপকার দিবে, তারা যদি সবুর করে (ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/৩২৫ পৃঃ)।

৩। ফুকাহার একটি জামাআত বলেন ঃ সাত দিনের পরেও আক্বীকা করা সুন্নাত, চায় ২ মাস হোক অথবা এক বছর হোক, অথবা তার চাইতে বেশি সময় হোক (ফাতাওয়াহ্ ইসলামিয়া ২/৩২৬)।

৪। সঙ্গত কারণে যদি সময়মত না করা হয় তাহলে পরবর্তীতে সুযোগমত যে কোনো সময়ে আদায় করে নিবে (ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল ফাতওয়া লাজনা দায়েমা, ফাতওয়া মাওদুদ ৬৩ পৃঃ, আলবানী নং ১৭৭৬, মাজমু ফাতওয়া উসাইমিন, সিরসিলাতুল হুদাওয়ান নুর ২৫/২১৫, অডিও ক্লিপ নং ১৯৯)।

শাফেঈ বিদ্বানগণের সাত দিনে আক্বীকার বিষয়টি সীমা নির্দেশমূলক নয় বরং ইখতিয়ারমূলক

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন সাত দিনে আক্বীকার অর্থ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সাতদিনের পরে আক্বীকা করবে না (নাইলুল আওতার ৬/২৬১ পৃঃ)।

আমাদের মত ঃ উপরের যে মতামত আলোচনা করা হয়েছে তা শুধু দুই হাদীসের উপর কিয়াস করে তাদের নিজের মত পেশ করেছেন। আমাদের মতানুসারে জন্মের সপ্তম দিনেই আক্বীকা দিতে হবে কারণ আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস বা বাণীর দ্বারা শুধু সপ্তম দিনের কথাই বলা হয়েছে, তাই সপ্তম দিনেই করা উচিত। কারণ সপ্তম দিনের পর আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কোনো সাহাবী আক্বীকা করেছেন তার কোনো নজীর বা দলীল পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য যে — রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নবুআত লাভের পর নিজের আক্বীকা নিজে করেছিলেন বলে বাইহাক্বীতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসটি মুনকার বা দুর্বল (নাইলুল আওতার ৬/২৬৪ পৃঃ)। বরং এটাই প্রমাণিত যে, তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর আক্বীকা করেন ও নাম রাখেন মুহাম্মাদ (বাইহাক্বী, দালায়েল নবুঅত ১/১১৩ পৃঃ, বেরুত ১৯৮৫, সুলাইমান মানসুরপুরী (রহঃ) ১/৪১ পৃঃ দিল্লী ১৯৮০)।

গরু ও উটে আক্বীকা চলে কি?

হাদীসের মধ্যে যেসব পশুর কথা উল্লেখ আছে তা হল ছাগল ও দুম্বা। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত -

عن الغلام شاتان مكافئتان و عن الجارية شاة.

(আবূ দাউদ হাঃ ২৮৩৪)

عق عن الحسن و الحسين بكبشين كبشين.

(নাসাঈ ৪২২৪)

উক্ত বর্ণনাগুলো হতে বুঝা যায় যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আক্বীকার জন্য শুধু ছাগল এবং দুম্বার বর্ণনা করেছেন। এইজন্য শুধুমাত্র এই পশু দ্বারাই আক্বীকা করতে হবে।

অবশ্যই কিছু উলামা আক্বীকা করার জন্য উট এবং গরু যবেহ করার মত পেশ করেছেন, যেমন ইমাম শাওকানী বলেন

و الجمهور على اجزاء البقرو الغنم. —

জমহুর উট এবং গরু (আক্বীকার জন্য) যথেষ্ট মনে করেছেন (নাইলুল আওতার ৩/৫০৬)।

ডাক্কুর অহাবাহ্ যাহেলী নকল করে বলেন —

هى مثل الاضحية من الانعام : الابل و البقر و الغنم و قيل لا يعق بالبقر لا بالابل.

অর্থ ঃ আক্বীকাও কুরবানীর মত অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া যবেহ করা যাবে এবং এটাই বলা হয়েছে যে, গরু এবং উট আক্বীকার জন্য যবেহ করা যাবে না (আল্ ফিকহু ইসলামিয়া অ আদীল্লাহ্ ৩/৬৩৭)।

২। যে সমস্ত উলামাগণ আক্বীকার জন্য উট এবং গরু যবেহ করার জন্য জায়েয বলে ফাতাওয়া দিয়ে দলীল পেশ করেছেন তা হল নিম্নরূপ —

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত —

يعق عنه من الابل و البقر و الغنم.

(ত্ববারানী সাগীর ১/৮৪ পৃঃ, ফাতহুল বারী ১১/১১)।

উক্ত হাদীসটির তাহক্বীক ঃ হাদীসটি জাল। আল্লামা নুরুদ্দীন হায়সামী বলেন, এই হাদীসের সূত্রে মাসআদাহ্ ইবনু য়্যাসা নামে একজন মিথ্যুক বর্ণনাকারী আছেন (মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ৪ খণ্ড ৫৮ পৃঃ)।

উক্ত বর্ণনা হতে স্পষ্ট যে, সহীহ্ হাদীসে শুধু ছাগল এবং দুম্বা করার বর্ণনা পাওয়া গেল, তাই আক্বীকা শুধুমাত্র ছাগল এবং দুম্বা দ্বারাই করতে হবে।

আক্বীক্বার জন্তুর গুণাগুণ

আক্বীকার পশুর গুণাগুণ নিয়ে উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। যা নীচে আলোচনা করা হলো —

১। ইমাম তিরমিযী বলেন, ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, কুরবানীর পশুর ব্যাপারে যা যা যথেষ্ট আক্বীকার পশুর ব্যাপারে তাই-তাই যথেষ্ট। যেমন —

قالوا لا يجزئ فى العقيقة من الشاء الا ما يجزئ فى الاضحية.

২। ইমাম মালিক বলেন, আক্বীকা কুরবানীর মত। এতে এমন পশু বৈধ নয় যা কানা, অতি রোগা, শিং ভাঙা ও রোগা হয়। এর মাংস ও চামড়া বিক্রি করা যাবে না এবং হাড় ভাঙা চলবে না। এর মাংস সবাই খাবে এবং তা হতে কিছু সাদকাহ করবে। আর পশুর রক্ত সন্তানের কোনো জায়গায় মিলাবেনা (মুয়াত্তা মালিক ১৮৬ পৃঃ)।

২। আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, কোনো সহীহ্ বা যয়ীফ দ্বারাও আক্বীকার জন্তুতে এ সব শর্ত প্রমাণিত হয় না। তাই যারা শর্তের কথা বলেন তাদের কাছে কোনো দলীলই, নেই কিয়াস ও মনের খেয়াল ছাড়া (তুহফাতুল আহ্‌অযী ৫/৯৯ পৃঃ)।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, শরীআতী মাসলা বিনা দলীলে সাব্যস্ত হয় না (তুহফাতুল আহ্‌অযী ২/৩৬৫ পৃঃ)।

উক্ত চারজন মুহাদ্দিসের মধ্য হতে দুইজন মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ও ইমাম শওকানী (রহঃ) এর মতে ছোটখাটো দোষযুক্ত পশু আক্বীকা চলতে পারে। আমিও মনে করি যে, সহীহ্ হাদীস দ্বারা যেহেতু আক্বীকার পশুর সঙ্গে কুরবানীর পশুর কোনো গুণাগুণের শর্ত পাওয়া যায় না তাই নিজের মতানুযায়ী শর্ত লাগানো উচিৎ হবে না।

উল্লেখ্য যে, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যেমন —

عن الغلام شاتان مكافئتان و عن الجارية شاة.

অর্থ ঃ ছেলের পক্ষ হতে সমান সমান দুইটি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি ছাগল আক্বীকা হিসাবে যবেহ করতে হবে (আবূ দাউদ ২৪৫৮)।

উক্ত হাদীসে مكافئتان শব্দ দ্বারা ছেলের আক্বীকার পশু দুটি সমান সমান হতে হবে প্রমাণিত। অপর একটি হাদীস তা প্রমাণ করে না। যেমন- عن الغلام شاتان و عن الانثى و احدة.

অর্থ ঃ ছেলের পক্ষ হতে দুটি ছাগল আর মেয়ের পক্ষ হতে একটি ছাগল। সারকথা হল সমান সমান জরুরী নয় (অর্থাৎ একটি দাঁতওয়ালা অপরটি দাঁতওয়ালা নয়) তবে সমান সমান হওয়া ভালো।

আক্বীকার দিনে আমাদের করণীয় কর্তব্য কী?

সপ্তম দিনে তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে। যেমন —

১। সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—

كل غلام رهينة بعقيقه تذبح عنه يوم سابعه و يسمٰى فيه و يحلق رأسه.

প্রত্যেক শিশুই তার আক্বীকার সাথে বন্ধক থাকে। তার সপ্তম দিনে আক্বীকার জানোয়ার যবেহ করতে হবে। ঐ দিনে নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে (আবূ দাউদ ২৮৩৮, ৩৬২ পৃঃ)।

২। চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সাদকা করতে হবে। যেমন

عن على بن ابى طالب قال عقّ رسول ﷺ عن الحسن بشاة و قال يا فاطمة احلقى راسه و تصدقى بزنة شعره فضّة قال فوزنته فكان و زنه درهمًا او بعض درهمٍ.

অর্থ ঃ আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হাসানের পক্ষ হতে একটি ছাগল আক্বীকা করলেন এবং বললেন, হে ফাতিমা তার মাথাটি কামিয়ে দাও এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সাদকা কর। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা তার চুলগুলি ওজন করলাম, তার ওজন এক দিরহাম বা তার চাইতে কিছু কম হল (তিরমিযী ৪১৫৪, ইরওয়া হাঃ ১১৭৫, হাদীসটি সহীহ্)।

কাজেই সপ্তম দিনে মাথা কামিয়ে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সাদকা করা উত্তম।

আক্বীকার মাংস ও চামড়ার মাসলা

আক্বীকার পশুর মাংস ও চামড়া বিতরণ করার জন্য কোনো সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায় না। যে রকম কুরবানীর মাংস খাওয়া বা দেওয়ার কথা পাওয়া যায়।

فكلوا منها و اطعموا البآئس الفقير.

অর্থ ঃ অতঃপর তোমরা তা হতে খাও এবং দুস্থ অহাবগ্রস্তকে খাওয়াও (সূরা হজ্জ, ২২/২৮)।

فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر.

অর্থ ঃ অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাজ্ঞাকারী অভাগ্রস্তকে (সূরা হজ্জ, ২২/৩৬)।

عن عاشة رضـ قالت : قال رسول ﷺ كلوا و ادخروا و تصدقوا.

অর্থ ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, (কুরবানীর মাংস) তোমরা খাও, জমা রাখো এবং সাদকা কর (মুসলিম ১৯৭১)। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, খাও, খাওয়াও এবং সাদকা কর (বুখারী)।

সারকথা ঃ কুরবানীর পশুর মত আক্বীকার পশুর ক্ষেত্রে কোনো শর্ত নেয়। কুরবানীর গোশতের মত আক্বীকার গোশতের ক্ষেত্রেও কোনো শর্ত নেই। নিজে খেতে পারে, সৌজন্যমূলক প্রতিবেশীকেও দিতে পারে এবং রান্না-বান্না করে মানুষকে খাওয়াতেও পারে। এ ব্যাপারে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পক্ষ হতে কোনো পালনীয় বিধান নেই।

আক্বীকার পশুর যবেহর নিয়ম ও দুআ

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ক্বাতাদাহ্ (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আক্বীকা যবেহ হবে কীভাবে? তিনি বলেন, ক্বিবলার দিকে পশুটির মুখ করবে। তারপর তার গলায় ছুরি রাখবে। অতঃপর বলবে. اَللّٰهُمَّ مِنۡكَ وَ لَكَ عَقِيۡقَةَ فُلَانًا بسم الله الله اكبر.

তারপর যবেহ করবে (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৮ম খণ্ড ২৪৫ পৃঃ)।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তোমরা শিশুর নামের উপরে যবেহ কর এবং বল

بِسۡمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكۡبَرُ مِنۡكَ وَ لَكَ هٰذِهٖ عَقِيۡقَةُ فُلَانٍ.

(সুনানে বাইহাক্বী ৯ম খণ্ড ৩০৩ পৃঃ)।

আক্বীকার পশু যবেহর সময় শিশুটির নাম নিয়ে বাংলায় এরূপ বললে চলবে যে, এটা উমুকের আক্বীকা। তারপর বলবে—

اَللّٰهُمَّ مِنۡكَ وَ لَكَ بِسۡمَ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكۡبَرُ.

অতঃপর ছুরি চালাবে।

উল্লেখ্য যে, ভারতের দেওবন্দী ও বেরেলী দুই বিখ্যাত হানাফী আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এবং মাওলানা আমজাদ আলী ব(রহঃ) বলেন, আক্বীকার মাংস শিশুটির পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা, নানীকে খাওয়া নিষেধ (বেহেশতী যেওর ৩য় ভাগ ৪৩ পৃঃ, বাহারে শারীআত ১৫ ভাগ ১২৯ পৃঃ)।

এই ফাতাওয়ার উপর ভিত্তি করে কিছু মানুষ মনে করেন আক্বীকার পশুর মাংস পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী খেতে পাবে না এটা একটি ভিত্তিহীন ফাতাওয়া।

আসল কথা হলো এটা আক্বীকা দাতার নিজের মাংস। সে নিজেও খেতে পারে, বন্ধুকে, পাড়ার প্রতিবেশীকেও খাওয়াতে পারে এবং গরীব মানুষকেও খাওয়াতে পারে। যেহেতু রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে এবং সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। যেমন ইমাম আহমাদ বলেন, আক্বীকার মাংস, পানি, লবণ দিয়ে রান্না করে প্রতিবেশী এবং গরীব মিসকীনদের তুহফা দেওয়া ভালো কাজ। আর যদি অন্যান্য মাসলা দিয়ে আরো ভালো করে রান্না করে দেওয়া হয় তাহলে ফকীর মিসকীন এবং প্রতিবেশীর প্রতি আরো বেশি দয়া করা হবে (তুহফাতুল মাওদুদ ৪৩ পৃঃ)।

চামড়া ঃ বিখ্যাত সাহাবী ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আক্বীকার পশুর চামড়া বিক্রি করে দিয়ে তার মূল্য সাদকা করে দিতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান বলেন আক্বীকা ও কুরবানীর চামড়া কসাই ও পাচককে মজুরী হিসাবে দেওয়া আপত্তিকর (তুহফাতুল মাউদূদ ৫২ পৃঃ)।

পরিশেষে এই দুআ করি হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে শরীআত মুতাবিক তোমার যাবতীয় বিধান অনুযায়ী চলতে পারি বা আমল করতে পারি তার ক্ষমতা দাও — আমীন।

শেষ পর্ব

সাহাবাদের গাল-মন্দ ও দোষারোপ করার ভয়াবহতা

আব্দুর রাকীব মাদানী

সাহাবাগণের মান-মর্যাদা ও সততা প্রমাণে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাণী ঃ সাহাবাগণের মান-মর্যাদা, সততা ও বিশ্বস্ততা এবং তাদের গাল-মন্দ না করার বিষয়ে বহু সহীহ্ হাদীস বিদ্যমান। আমরা এই প্রবন্ধে তারই সামান্য বর্ণনা দেওয়ার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ্।

عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال النبى ﷺ : لا تسبوا أصحابى، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم، و لا نصيفه.

আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমার আমার সাহাবাদের গালি দিবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ খরচ করে দেয়, তবুও (সওয়াবের দিক দিয়ে) তাদের এক অঞ্জলি বা অর্ধ অঞ্জলি খরচের মত হতে পারে না'' (বুখারী, ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়, নং ৩৬৭৩, মুসলিম, ফাযায়েলে সাহাবা নং ২৫৪০)।

উল্লেখিত হাদীসটিতে যেমন সাহাবাগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি স্পষ্টভাবে তাঁদের গালি দিতে নিষেধও করা হয়েছে।

ত্বাবারানী তাঁর আল কাবীর গ্রন্থে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন —

قال رسول الله ﷺ من سبّ أصحابى فعليه لعنة الله، و الملائكة، و الناس أجمعين.

যে ব্যক্তি আমার সাথীদের গালি দিবে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের এবং সকল লোকের অভিশাপ হবে (ত্বাবারানী, আল কাবীর ১০/২৮৯ নং ১২৫৯১)। শাইখ আলবানী সমস্ত সূত্রের আলোকে বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন (সিলসিলাহ্ সহীহা নং ২৩৪০)।

ইমরান বিন হুসাইন হতে বর্ণিত নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

خير أمتى قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (قال عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة)، ثم ان بعدكم قوماًيشهدون و لا يستشهدون، و يخونون و لا يؤتمنون، و ينذرون و لا يفون ، و يظهر فيهم السمن.

আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠদের যুগ আমার যুগ অতঃপর তার পরের যুগ অতঃপর তার পরের যুগ (ইমরান বলেন ঃ আমার স্মরণ নেই তিনি তাঁর যুগের পর দুই যুগ না তিন যুগ উল্লেখ করেছিলেন), তারপর এমন যুগ আসবে যে সময় লোকেরা নিজে সাক্ষী দিবে অথচ তাকে সাক্ষীর জন্য তলব করা হবে না, খেয়ানত করবে আমানত রক্ষা করবে না, মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না এবং তাদের মাঝে মেদবহুল (মোটা শরীর) প্রকাশ পাবে (সহীহ্ আল্ বুখারী নং ২৫০৮ এবং ৬০৬৪, সুনান বায়হাক্বী কুবরা নং ২০১৭৫)।

এই হাদীসে প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর যুগের উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন, যে যুগে অবস্থানকারীগণ নিঃসন্দেহে তাঁর সাহাবাগণ ছিলেন। তাই তাঁরা নাবীর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আর শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সম্মানের পাত্র, গালির পত্র নয়, বরং তাঁদের শানে গালি একবারে অসমীচীন।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরও বলেন —

أية الايمان حب الأنصار، وأية المنافق بغض الأنصار

আনসার সাহাবীদের ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন এবং আনসার সাহাবাদের ঘৃণ্য করা মুনাফেকের নিদর্শন (সহীহ্ বুখারী নং ১৬, সহীহ্ মুসলিম নং ১০৮)।

আনসার সাহাবা যাঁরা মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবাগণকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁরা ঈমান ও নিফাক পরিচয়ের মানদণ্ড। যারা তাঁদের ভালবাসে তারা মুমিন এবং এই

ভালবাসা তাদের ঈমানের লক্ষণ। আর যারা তাঁদের ঘৃণা করে তারা মুনাফিক আর এই ঘৃণা তাদের নিফাকের লক্ষণ। হাদীস খুবই স্পষ্ট যে, যাদের ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ তাদের গালিগালাজ করা মুনাফেকীর আলামত, যা ঈমান বিধ্বংসকারী ঘৃণিত অপরাধ।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরও বলেন —

يـأتى على الناس زمان، فيغزو فئام الناس فيقولون لهم : فيـكـم مـن صاحب رسول الله ﷺ؟ فيقولون : لهم نـعـم فيفتح لهم، ثم يأتى على الناس زمان فيغزو فئام الـنـاس، فيـقـال : فيكم من صاحب أصحاب رسول الـلّـه ﷺ ؟ فيـقـولون : نعم فيفتح لهم، ثم يأتى على الـنـاس زمان، فيغزو فئام من الناس فيقال : هل فيكم مـن صـاحـب أصـحـاب أصحاب رسول الله ﷺ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم.

লোকদের উপর এমন সময় আসবে, তখন তাদের একদল জিহাদে লিপ্ত থাকবে। তারপর তাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে, তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছেন কি যিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে প্রত্যক্ষ করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। তাঁরা তখন বিজয়ী হবে। তারপর মানুষের মাঝখান থেকে একদল জিহাদ করতে থাকবে। তাদের প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের মাঝে এমন কোন লোক আছেন কি, যিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবাগণকে প্রত্যক্ষ করেছেন? তারা তখন বলে উঠবে, জি হ্যাঁ। তখন তারা জয়ী হবে। অতঃপর অপর একটি দল যুদ্ধ করতে থাকবে। তখন তাদের প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের মাঝে এমন কেউ কি আছেন, যিনি সাহাবীদের সাহচর্য অর্জনকারী অর্থাৎ তাবিঈকে প্রত্যক্ষ করেছেন? তখন লোকেরা বলবে, জি হ্যাঁ। তখন তাদের বিজয় হবে (সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবাগণের ফযীলত নং ৬৩৬১)।

উল্লেখিত হাদীসটিতে সাহাবা ও তাবেঈনদের মর্যাদা ও কারামাত বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের উপস্থিতিতে ইসলাম জয় লাভ করেছে এবং অভিযান সফল হয়েছে। আর এমন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে গালাগালি করা অর্থাৎ তাঁদের অসম্মান করা, যা মুমিনের কাজ হতে পারে না।

সাহাবাদিগকে গাল-মন্দকারীদের খণ্ডনে সালাফদের মূল্যবান উক্তি ঃ ইসলামের সূত্র ন্যায়পরায়ণ সাহাবাদের সম্বন্ধে যারা কটূক্তি করে ও অপবাদ দেয়, তাদের ব্যাপারে আমাদের বিচক্ষণ সালাফগণ বহু মূল্যবান কথা বলেছেন। কারণ তাঁরা এর ভয়াবহ পরিণাম বুঝতেন এবং এসব অপবাদ যে দ্বীনের মৌলিক বিধানের বিপরীত তাও তাঁরা জানতেন। আমরা এ পর্বে তাঁদের সেই মূল্যবান উক্তি সমূহের কিছুটা উল্লেখ করবো ইন্শাআল্লাহু তাআলা।

১। ইমাম মালিক (রাহেঃ) বলেন —

انـمـا هـؤلاء اقوام أرادوا الـقـدح فى النبى ﷺ ، فلم يـمكنهم ذلك، فقدحوا فى اصحابه، حتى يقال رجل سوء و لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون.

এরা এমন গোষ্ঠী যারা স্বয়ং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দুর্নাম করার ইচ্ছা রাখে কিন্তু তা সম্ভবপর না হওয়ায় তারা তাঁর সাহাবীদের দুর্নাম করে ও তাঁদের অপবাদ দেয় যেন বলা হয় যে, সে মন্দ ছিল। যদি তিনি সৎ ব্যক্তি হতেন, তাহলে তাঁর সাথীরাও সৎ হত (আস্ স্বরিম আল মাসলূল, ইবনু তায়মিয়া ৫৮০)।

২। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহেঃ) বলেন ঃ ''যদি কোনো ব্যক্তিকে দেখো সে কোনো সাহাবীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছে, তাহলে তার ইসলামে সন্দেহ আছে" (আল্ বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাসীর ৮/১৪২)।

৩। আবু যুরআহ আর রাযী (রাহেঃ) বলেন ঃ ''যদি কোনো ব্যক্তিকে দেখো সে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথীদের মধ্যে কারো দোষ বর্ণনা করছে, তাহলে জেনে নিও সে ইসলাম শত্রু নাস্তিক। কারণ আমাদের নিকট রসূল সত্য এবং আল্ কুরআন সত্য। আর এই কুরআন ও সুন্নাহ্ আমাদের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর সাহাবাগণ (অর্থাৎ তাঁরা ইসলামের সূত্র ও সাক্ষী)। ইসলাম শত্রুরা আমাদের সাক্ষীদের অভিযুক্ত করতে চায় যেন কিতাব ও সুন্নাহ্ বাঞ্চাল হয়ে যায়। প্রকৃতার্থে তারাই অভিযুক্ত। তারা হচ্ছে নাস্তিক (আল্ কিফায়া, খত্বীব বাগদাদী, পৃঃ ৯৭)।

৪। আবু আব্দুর রাহমান নাসাঈ (রাহেঃ) কে আল্লাহ্র

রসূলের সাহাবী মুআবিয়া বিন আবী সুফইয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন , ''ইসলামের উপমা একটি দরজাযুক্ত ঘরের ন্যায়। আর ইসলামের দরজা হচ্ছে সাহাবাগণ। তাই যে সাহাবীকে কষ্ট দেয়, তার উদ্দেশ্য ইসলাম। ঐ ব্যক্তির মত যে দরজা ঠকঠকায় কারণ তার উদ্দেশ্য ঘরে প্রবেশ করা। তিনি বলেন ঃ তাই যে মুআবিয়াকে উদ্দেশ্য করে আসলে তার উদ্দেশ্য সাহাবাগণ (তাহযীবুল কামাল ১/৩৩৯, বুগইয়াতুর রাগিব পৃঃ ১২৯)।

৫। উমার বিন আব্দুল আযীয (রাহেঃ) কে সে সব যুদ্ধের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সাহাবাদের মাঝে সংঘটিত হয়। তিনি বলেন, ''সে রক্ত থেকে আল্লাহ্ আমার হাত পবিত্র রেখেছেন, তাই আমার জিহ্বাকে তা থেকে পবিত্র রাখা উচিৎ হবে না কি? আল্লাহ্‌র রসূলের সাথীদের উপমা চোখের মত। আর চোখের ঔষধ হচ্ছে, তা স্পর্শ না করা'' (আল জামি লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী ১৬/১২২)।

৬। ইমাম ত্বহাবী (রাহেঃ) বলেন —

وحبهـم - أى الصحابة - دين و ايمان، و بغضهم كفر ونفاق و طغيان

তাদেরকে ভালোবাসা (অর্থাৎ সাহাবাদের ভালোবাসা) দ্বীন ও ঈমানের অংশ এবং তাঁদের ঘৃণ্য করা কুফর, মুনাফেকী ও সীমালঙ্ঘন (শারহুত্ ত্বাহাবিয়া ৫২৮)।

৭। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রাহেঃ) সাহাবাদের মাঝে সংঘটিত বিবাদ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের নীতির এইভাবে বর্ণনা দেন — ''তারা সাহাবাদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদ সম্পর্কে নিরবতা পালন করে এবং বলে, তাদের দোষ-ত্রুটি সংক্রান্ত বর্ণিত বর্ণনাগুলির মধ্যে কিছু এমন বর্ণনা রয়েছে যা, মিথ্যা ও জাল আর কিছু এমন রয়েছে যা বিকৃত ও পরিবর্তিত। এ বিষয়ে সঠিক মত হচ্ছে, তারা সে সব বিষয়ে মা'যুর। হয় এমন ইজতিহাদকারী যাদের সিদ্ধান্ত সঠিক কিংবা এমন ইজতিহাদকারী যাদের সিদ্ধান্ত ভুল'' (শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেত্বিয়া, মুহাম্মদ খলীল হার্রাস, পৃঃ ১৭৩)।

৮। আবু আব্দুল্লাহ্ ইবনু বাত্তাহ্ আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা বর্ণনা করার সময় বলেন ঃ ''এরপর আল্লাহ্‌র রসূলের সাহাবাদের মাঝে যে সব বিবাদ হয়, আমরা সে সব বিষয়ে নিরব থাকি। তাঁরা এমন সম্প্রদায় যাঁরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সকল অভিযানে উপস্থিত থেকেছেন এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন; কারণ আল্লাহ্ তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাদের তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছেন ও তাঁদের ভালোবাসার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে বলেছেন। আর এটা তাঁর নাবীর মুখে ফরয করেছেন; অথচ তিনি জানেন যে তাঁরা আপসে লড়াই করবেন। তাঁদের মর্যাদা এ কারণে সকলের উর্ধ্বে যে, তাঁদের ইচ্ছাকৃত ভুল ও তাঁদের আপসের মধ্যে সংঘটিত কলহ-বিবাদ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে'' (কিতাবুশ্ শারহ ওয়াল ইবানাহ্ আলা উসূলিস সুন্নাহ্ ওয়াদ্দিয়ানাহ্, ইবনু বাত্তাহ্ পৃঃ ২৬৮)।

সাহাবাদিগকে গাল-মন্দ করার ভয়াবহ পরিণাম ঃ এটা প্রমাণিত যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ব্যাপারে মিথ্যা বলা সাধারণ মিথ্যা বলার মত নয়। ঠিক তেমনি সাহাবাদের গালিগালাজ করা সাধারণ লোককে গাল-মন্দ করার মত নয়, বরং এর ভয়াবহতা ও পরিণাম অনেক সুদূরপ্রসারী। সাহাবাদের গাল-মন্দকারী শিয়া-রাফেযী সম্প্রদায় সামান্য কিছু সাহাবী ব্যতীত সকল সাহাবাদের কাফের-মুর্তাদ বলে কিংবা ফাসেক বলে কিংবা তাঁদের সততায় প্রশ্ন তোলে ও অপবাদ দেয়। তাঁদের সম্বন্ধে এরকম যে কোনো বিশ্বাসই ভয়াবহ। আমরা এ পর্বে তারই কিছুটা বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো — ইনশাআল্লাহ্।

১। অধিকাংশ সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কে কাফের কিংবা মুর্তাদ মনে করা অথবা তাঁদের অধিকাংশকে ফাসেক মনে করার পরিণাম হচ্ছে কুরআন ও সুন্নায় সন্দেহ পোষণ করা, কারণ বর্ণনাকারী দোষণীয় হলে বর্ণনাও দোষযুক্ত হবে। ফলে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, আমরা কীভাবে ঐ গ্রন্থের প্রতি ভরসা করতে পারি, যে গ্রন্থকে ফাসেক বা মুর্তাদরা বর্ণনা করেছে। হয়তঃ এ কারণে কতিপয় পথভ্রষ্ট ও বিদ্আতীদের দেখা গেছে তারা সাহাবাদের গালি দেয়। তারা স্পষ্টভাবে বলে ঃ আল্ কুরআন অক্ষত নয়; বরং তা বিকৃত। আর অনেকে এ বিশ্বাস প্রকাশ না করে গোপন রাখে।

এ মন্তব্য হাদীসের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য, কারণ সাহাবাগণ অসৎ কিংবা অভিযুক্ত হলে হাদীসের সনদ অভিযুক্ত হয়ে পড়বে ফলে সম্পূর্ণ হাদীস ভাণ্ডার অগ্রহনীয় হয়ে যাবে।

২। এই ভ্রান্ত মতকে কিছুক্ষণের জন্য মান্যতা প্রদান করলে এর পরিণাম স্বরূপ একথা বলা বৈধ হবে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু

আলাইহি অ সাল্লাম) এর এই উম্মত মন্দ উম্মত এবং এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরা মন্দ প্রকৃতির ছিল। আর স্বর্ণ যুগের সাধারণ লোকেরা কাফের বা ফাসেক ছিল এবং সেটা ছিল মন্দ শতাব্দী। কত ঘৃণিত মন্তব্য যা তাদের মুখে উচ্চারিত হয়।

৩। এই মতের ফলে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি জরুরী হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ্ আল্লাহ্কে অজ্ঞতার দোষে দোষী করা কিংবা ঐ সমস্ত দলীলাদিকে নিরর্থক মনে করা যাতে সাহাবাগণের প্রশংসা করা হয়েছে।

যদি মহান আল্লাহ্ তাঁদের সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন (তিনি তাদের এমন মন্তব্য হতে পুত-পবিত্র) যে, তাঁরা অচিরে কাফের হয়ে যাবেন, তারপরেও আল্লাহ্র তাঁদের প্রশংসা ও তাঁদের জন্য পুরস্কারের অঙ্গীকার করা এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। আর আল্লাহ্র শানে পরিহাস অসম্ভব (ইতহাফু যাউইন নাজাবাহ, মুহাম্মাদ বিন আল আরাবী পৃঃ ৭৫)।

এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্র হিকমত ও বিধান প্রশ্নের আওতায় চলে আসে। এইভাবে যে, আল্লাহ্ তাঁদের তাঁর নাবীর সাহচর্যের জন্য চয়ন করেন তাই তাঁরা নাবীর সাথে সংগ্রাম করে, তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করেন এবং তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক গড়ে তুলেন। উদাহরণ স্বরূপ যেমন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর দুই সুপুত্রীর বিবাহ উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে দেন এবং তিনি স্বয়ং আবু বাকর ও উমারের কন্যাকে বিবাহ করেন। মহান আল্লাহ্ জ্ঞাত থাকা সত্বেও কীভাবে তাঁর নাবীর জন্য এমন সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয় নির্বাচন করতে পারেন, যারা ভবিষ্যতে ইসলাম ত্যাগী কাফের হয়ে যাবে?

৪। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ২৩ বছর ধরে তাঁর সাহাবাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অক্লান্ত চেষ্টা চালান, যেন আল্লাহ্র করুণায় একটি ঐতিহাসিক আদর্শ সমাজ গঠিত হয়। ফলে, সমাজের লোকেরা তাদের আখলাক-চরিত্রে, আল্লাহ্ ভীরুতায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায় ইত্যাদিতে আদর্শবান হয়। পরক্ষণে যদি কেউ এমন বিশ্বাস করে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর তাঁর সাহাবারা দু-চার জন ছাড়া সকলে ইসলাম থেকে ফিরে গিয়েছিলেন কিংবা তাঁরা মুনাফেক ছিলেন কিংবা তাঁরা সৎ ছিলেন না, তাহলে বলা সঙ্গত হবে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর মিশনে ব্যর্থ, তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ, তিনি অপরাদর্শী, তাঁর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দাওয়াতি নীতি ত্রুটিপূর্ণ এবং নাউযুবিল্লাহ্ - তিনি হয়তঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল নন। হলে ব্যর্থ হতেন না।

ফলশ্রুতিতে জগতের দাঈ ও মুসলেহগণও আস্থাহীন হয়ে পড়বেন, কারণ নাবী হওয়া সত্বেও যদি তিনি সাফল্য না পান তাহলে সাধারণ দাঈরা কীভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

সাহাবাদের গাল-মন্দকারীদের বিধান ঃ ইসলামী পন্ডিতগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, সাহাবাকে গাল-মন্দকারীর শাস্তি কী হওয়া উচিৎ। তাঁদের গাল-মন্দ করা কি কুফরী যে তার দন্ড হত্যা হওয়া চাই, না তাঁদের গাল-মন্দ করা ফাসেকী কাজ যার ফলে তাকে তা'যীর (তিরস্কার) স্বরূপ শাস্তি দেওয়া চাই?

প্রথম মত ঃ জ্ঞানীদের এক দল মনে করেন -যে সাহাবাদের গালি দেয়, তাদের দোষারোপ করে, তাদের ন্যায়পরায়ণতায় প্রশ্ন তোলে এবং স্পষ্টভাবে তাদের ঘৃণা করে, সে তার রক্ত হালাল করে নেয় তাকে হত্যা করা বৈধ; যতক্ষণে সে তাওবা না করে এবং সাহাবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করে।

ইমাম ত্বাহাবী তাঁর আক্বীদা গ্রন্থে বলেন ঃ তাঁদের ভালোবাসা (সাহাবাদের) দ্বীন ও ঈমান এবং তাঁদের ঘৃণা করা কুফরী, মুনাফেকী এবং সীমালঙ্ঘন (শারহুত ত্বহাবিয়া ৫২৮)।

যাহাবী বলেন ঃ 'যে সাহাবাদের দোষারোপ করে কিংবা তাদের গালি দেয়, সে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়; কারণ তাদের গাল-মন্দ করা তাদের সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস ও সত্য গোপনের বহিঃপ্রকাশ এবং মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে এবং মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর সুন্নাতে তাঁদের যে প্রশংসা করেছেন, তাঁদের যে মান-মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের যে ভালোবাসার বর্ণনা দিয়েছেন সে সবকে অস্বীকার করা হয় এবং এ কারণেও যে, তাঁরা হচ্ছেন কুরআন ও সুন্নাহ্র সবচেয়ে নির্ভরশীল ও পছন্দনীয় সূত্র। আর সূত্রকে দোষারোপ করা মানে মূলকে দোষারোপ করা। বর্ণনাকারীকে ঘৃণা করা মানে বর্ণনাকে ঘৃণা করা। নিফাক, নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসী ছাড়া যে কেউই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তার নিকট এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে (আল্ কাবাইর ২৩৫)।

এই মত পোষণকারীগণ নিম্নোক্ত প্রমাণ প্রদান করেছেন

১। সাহাবাদের গাল-মন্দ করা, তাঁদের সমালোচনা করা এবং তাঁদের দোষারোপ করা হচ্ছে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কষ্ট দেওয়া, তাঁর সমালোচনা করা এবং তাঁর অসম্মান

করা; কারণ সাহাবাগণ হচ্ছেন তাঁর সাথী যাঁদের তিনি শিক্ষা দেন এবং পরিশুদ্ধ করেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রাহেঃ) বলেন, 'এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেওয়া হত্যাবশ্যিক কুফরী কাজ' (আস্ স্বরিম আল মাসলূল ৫৮০)।

২। সাহাবাদের দোষারোপ করা ও তাঁদের আঘাত করার সারাংশ হচ্ছে ইসলামী শরীআতের সকল বিধান বাতিল ও বাঞ্চাল করা; কারণ তাঁরাই সেই বিধান বর্ণনাকারী ও প্রচারকারী।

কুরতুবী (রাহেঃ) বলেন ঃ 'যে কেউ তাঁদের কোনো একজনের অসম্মান করে কিংবা তাঁদের গাল-মন্দ করে, সে মহান আল্লাহ্র খণ্ডন করে এবং মুসলিমদের শরীআত বাঞ্চাল করে' (আল্ জামে লি আহকামিল কুরআন ১৬/২৯৯)।

৩। সাহাবাদের গাল-মন্দ করার পরিণাম ইজমা তথা উম্মতের সর্বসম্মতিকে অস্বীকার করা; কারণ তাঁদের বিরোধিতা প্রকাশ পাবার পূর্বে তাঁদের মান-মর্যাদায় কোনো মতভেদ ছিল না এবং কিতাব ও সুন্নাতের পৌনোপুনিক সূত্রে এটা সুসাব্যস্ত যে, তাঁরা তাঁদের রবের নিকট সম্মানিত (আল্ আজবিবাহ্ আল ইরাক্বিয়াহ্ ৪৯)।

দ্বিতীয় মত ঃ জ্ঞানীদের আর এক দল মনে করেন, সাহাবাদিগকে গাল-মন্দ করা কুফরী নয়; বরং এমন করলে সে ফাসেক ও ভ্রষ্ট বিবেচিত হবে। তাকে হত্যার দণ্ডে দণ্ডায়িত করা হবে না; বরং কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। ইসহাক্ব বিন রাহুআইহ্ বলেন, 'যে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথীকে গালি দিবে, তাকে শাস্তি দিতে হবে এবং তাকে জেলবন্দী করা হবে' (আস্ স্বরিম আল মাসলূল ৫৬৮)।

এই মত পোষণকারীগণ নিম্নোক্ত প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন

১। বুখারী ও মুসলিম তাঁদের উভয় সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আব্দুর রহমান বিন আউফকে গালি দেওয়ার কারণে খালিদ বিন ওয়ালীদকে বলেন, ''তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিবে না। যাঁর হস্তে আমার জীবন আছে তাঁর কসম ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত বরাবর স্বর্ণ খরচ করে দেয়, তবুও তাঁদের এক বা অর্ধাঞ্জলি সমতুল্য হতে পারবে না'' (বুখারী ৩৩৯৭, মুসলিম ৪৬১১)।

বর্ণনার সারাংশ ঃ উক্ত হাদীসে সাহাবাদের গাল-মন্দকারীর শাস্তি হত্যা উল্লেখ হয়নি।

روى الامام أحمد باسناده الى أبى برزة الأسلمى قال : أغـلظ رجل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : فـقال أبو برزة : ألا أضرب عنقه قال : فانتهره، و قال : ما هى لأحد بعد رسول الله ﷺ.

ইমাম আহমাদ স্বীয় সূত্রে আবু বারযা আল্ আসলামী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ ''এক ব্যক্তি আবু বাকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে কঠোর কথা বলে ঃ তখন আবু বারযাহ্ বললেন, তার গর্দান উড়িয়ে দেব না কি ? এটা শুনে তিনি তাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পর কারো জন্য এটা প্রযোজ্য নয়'' (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১/৯)।

৩। আল্লাহ্ তাআলা, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং সাধারণ মুমিনদের কষ্ট দেওয়ার মাঝে পার্থক্য করেছেন। প্রথমটির ক্ষেত্রে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত বলেছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে তিনি বলেন ঃ সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে (সূরাহ্ নিসা/১১২)।

কেবল মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করা, হত্যাযোগ্য অপরাধ নয়, বরং সাধারণ দণ্ডযোগ্য।

মতভেদের সারাংশ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ইসলামী গবেষকগণ সাহাবাদের গাল-মন্দকারীর উর্ধ্ব দণ্ড হত্যা পর্যন্ত বলেছেন আর নিম্ন দণ্ড হত্যা ব্যতীত কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন কিন্তু দণ্ড অবধারিত, যা অবশ্যই অপরাধ হওয়া প্রমাণ করে।

উপসংহার ঃ ইসলাম একটি প্রাকৃতিক স্বচ্ছ, ও সুরুচীপূর্ণ ধর্ম, তাতে সাধারণ লোককে কঠোর ভাবে গালি দেওয়া নিষেধ। আর সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে যদি এই বিধান হয়, তাহলে ন্যায়পরায়ণ ও ইসলামের সূত্র মর্যাদাবান রসূলের সাথীদের গাল- মন্দ করা কত বড় অপরাধ হতে পারে, তা সহজে অনুমেয়।

সাহাবাদের গাল-মন্দ করা ও দোষারোপ করা যেমন কুরআন সুন্নাহ্ বিরোধী তেমন ইসলাম শত্রুতাও বটে। তাঁরা হচ্ছেন ইসলামের দরজা, শরীয়ার সূত্র, ইসলাম প্রচারক, প্রকৃত নমুনা। যদি তাঁরা দোষযুক্ত ও ঘৃণিত হয়ে যান তাহলে সম্পূর্ণ ইসলামই দোষণীয় হয়ে পড়বে। আর এমন জঘন্য ও ন্যক্কারজনক পদক্ষেপ কোনো মুসলিম নিতে পারে না। যারা এমন করে, তারা ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট এবং ইসলাম শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার।

আমাদের সম্মানিত সালাফগণ বিষয়টির সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও ভয়াবহতা ভালভাবে অনুধাবন করেছেন তাই তাঁরা এ সম্বন্ধে প্রচুর যুক্তিসম্মত সুন্দর জ্ঞানগর্ভ মতামত পেশ করেছেন। তাঁদের জ্ঞানের আলোকে জীবনযাপন সহ এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে তাঁদের অনুকরণ করা একান্ত কাম্য এবং তাতেই রয়েছে ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ।

আদর্শ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে মসজিদের ভূমিকা

এম.এ. হান্নান

মহান আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা মক্কায় অবস্থিত, যা বরকতময় এ বিশ্বজাহানের দিশারী (৩/৯৬)। ইবাদাত করার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, ''আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি'' (৫১/৫৬)। ইবাদাত বলতে কেবমলাত্র স্বলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও কিছু আচার- আচরণকেই বুঝানো হয়নি। বরং ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সার্বিক কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র আল্লাহ্ ও রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রদর্শিত পথে সম্পন্ন করাই ইবাদাতের মর্মকথা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র, আইন-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-সন্ধি, পররাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশনা মুতাবিক সম্পন্ন করার নামই ইবাদাত। আল্লাহ্র কোনো বান্দা যখন ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ '' এই বিপ্লবী ঘোষণা দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই তার চিন্তা-চেতনা ও আক্বীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী সকল প্রকার গাইরুল্লাহ্র প্রভুত্ব খতম হয়ে এক আল্লাহ্র দাসত্বের শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে এবং এর প্রাথমিক নিদর্শন পেশ করার জন্য সে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে ধাবিত হয় আল্লাহ্র সে ঘরের দিকে যেখান থেকে দৈনিক পাঁচবার ঘোষণা আসছে ''আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান .... এসো স্বলাতের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে।'' স্বলাতের মাধ্যমেই সে কল্যাণের পথে যাত্রা করে এবং স্বলাতের দাবী অনুযায়ী সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সেই মহান আল্লাহ্র দাসত্বের প্রমাণ পেশ করে সেই মঞ্জিলে গিয়ে উপনীত হয় যেখানে রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামতরাজি।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা মসজিদের বাইরে বিস্তৃর্ণ কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ্র আইন বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইন মেনে চলার কারণে সার্বিক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। অথচ আমাদের সামনে রয়েছে ইসলামের স্বর্ণ যুগের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস, যে ইতিহাসের সূচনাকারী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ এবং পূর্ণতাদানকারী খোলাফায়ে রাশেদীন। যাঁরা আল্লাহ্ তাআলার এই শাশ্বত বাণী ধারণ করে পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন ''তোমাদের জন্য রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জীবনের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ'' (৩৩/২১)।

আমরা জানি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ তেরোটি বছর যাবৎ মক্কার অলিতে-গলিতে, পথে প্রান্তরে কালিমার শাশ্বত পয়গাম পেশ করে পথহারা মানুষদের এক আল্লাহ্র বন্দেগী করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া সত্যের এ আহ্বানে কেউ সাড়া দেয়নি। বরং দাওয়াত গ্রহণকারী মুসলিমদের উপর অকথ্য জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র প্রিয় বিশ্বনেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কাফিরদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন, যেখানকার অধিবাসীরা তার জন্য সবকিছু আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করে প্রাণ ঢালা অভিবাদন জানানোর জন্য ছিলেন চির উদগ্রীব।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সাথে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পবিত্র জন্মভূমি থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় হিজরত করলেন। পূর্ব থেকে সাহাবীদের বেশির ভাগই সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মদীনায় পৌঁছে মদীনার আনসারদের সহযোগিতায় গড়ে তুললেন একটি কল্যাণকর সমাজ, ইসলামী রাষ্ট্র। আর এ ছোট্ট নব গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেওয়ার জন্য প্রথমেই প্রতিষ্ঠা করলেন মসজিদে নববী। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদে নববীই ছিল তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এ মসজিদ কেবলমাত্র স্বলাতের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না বরং এটা ছিল ইসলামী ফৌজদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরামর্শ গৃহ, সেক্রেটারিয়েট। এ মসজিদে বসেই রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে কোথাও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা, তাদের সিপাহাশালা নিয়োগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করতেন। এ মসজিদকে ঘিরেই পরিচালিত হতো আর্থ সামাজিক যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড। প্রতিদিন স্বলাতের আগে পরে এবং জুমআর খুতবায় রসূল

(সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সমসাময়িক বিষয় এবং পরিস্থিতির উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করতেন। মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষাদান এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠিত থাকা একটি জাহেলী সমাজ দুনিয়ার ইতিহাসে একটি কল্যাণকর সভ্য সমাজে পরিণত হল। ন্যায়, ইনসাফ, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি ছিল সে সমাজের বৈশিষ্ট্য। জামে মসজিদের ভূমিকা সম্পর্কে কবি বলেন —

জামে মসজিদ আমাদের আদি ব্যবস্থা পরিষদ
উপাসনা শেষে বসে হেথা জনকল্যাণ সংসদ।
জুমআর খুতবা ইমামের বাণী জাতির কর্মসূচী।
ব্যক্ত করে সে মঙ্গল পথ আদর্শ অভিরুচি।
অর্থ, রাষ্ট্র, সমাজনীতির সমালোচনার পরে
খোতবা জাতির কল্যাণমুখী পথ নির্দেশ করে।
সে খোতবা আজ ভুলিয়াছি মোরা ঘুম পাড়া গান শুনি
ঘুমাইয়া তাই স্বর্গ লাভের স্বপ্নের জাল বুনি।
খোতবাহ্ রয়েছে, নেই প্রাণজাগা উমরের নির্দেশ
রয়েছে আযান নেই বেলালের মূর্ছনা অবশেষ।

বিশ্বে ৭৩ লাখ, ভারতে ৭ লাখ, পশ্চিমবঙ্গে ৭০ হাজারেরও বেশি মসজিদ আছে। ভারতে ২৭০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৭০ জন প্রতি একটি করে মসজিদ প্রতি বছর গড়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গের ২৫ হাজার গ্রামের বেশির ভাগ গ্রামে ১ থেকে একাধিক মসজিদ আছে। রাজ্যের ১৩০টি পৌরসভার বেশির ভাগে মসজিদ আছে। ভারতের সব মসজিদে শতকরা ৯০ জন ইমাম সাহেব আছেন। তাঁরা যেন ইসলামী সমাজ ও আল্লাহ্র আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ক খোতবা দেন এবং অন্য ওয়াক্তে আলোচনা রাখেন।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শাসনকাল পর্যন্ত ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। এই দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ মহামান্য খলীফা চতুষ্টয় সকলেই রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আদর্শ অনুযায়ী মসজিদকেই সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করার কারণে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং বিশ্বের ইতিহাস সে যুগকেই আখ্যায়িত করেছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসাবে। কিন্তু পরবর্তীতে কেবলমাত্র উমার ইবনু আব্দুল আযীযের আড়াই বছরের খেলাফত কাল ব্যতীত পরবর্তী সময়ে এই ব্যবস্থা কায়েম থাকেনি। পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ মসজিদ কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরিবর্তে নিজেদের প্রাসাদ কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিলাসী জীবন-যাপন তাদের কুরআন ও সুন্নাহ্র মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে নেমে আসে বিপর্যয়। সামগ্রিক কল্যাণ থেকে হয় বঞ্চিত। সেই ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত থাকায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তীনসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অতএব আমরা যদি পুনরায় আমাদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে চাই, বিশ্বের বুকে গর্বিত জাতি হিসাবে পরিচয় দিতে চাই তাহলে আমাদের ফিরে যেতে হবে দেড় হাজার বছর পূর্বের রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রদর্শিত মসজিদ ভিত্তিক আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে। একটি শান্তির সমাজ গঠনে এর বিকল্প নেই। বর্তমান যে সমস্যাগুলোর আবর্তে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি, তার সমাধান পেশ করতে হবে মসজিদ থেকেই। আর এ মহান দায়িত্বে নিয়োজিত ইমাম সাহেবদের পক্ষেই সম্ভব। কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে সমাধান পেশ করে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মসজিদকেন্দ্রিক আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ ও রাষ্ট্র জনগণকে উপহার দেওয়া উচিৎ।

মসজিদ প্রসঙ্গে একজন কমিউনিষ্ট নেতা মন্তব্য করেছিলেন, যদি আমার কাছে স্বলাতের মত দৈনিক লোকেরা পাঁচবার হাজির হয়, তাহলে আমি গোটা দুনিয়াকে কমিউনিষ্ট বানিয়ে নিতে পারব।

অতএব একজন কমিউনিষ্ট নেতা যদি সাহসের সাথে একথা বলতে পারে তবে আমাদের মসজিদের শ্রদ্ধেয় ইমামগণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য মুসল্লি তথা স্বলাত আদায়কারীদের কেন তৈরি করতে পারবেন না? তবে একথা ঠিক যে, ইমামগণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া অনেকেই জানেন না। তবে তাঁদেরকে জানানোর জন্য জরুরী চেষ্টা করা দরকার।

চিকিৎসা ও সমাজ বিজ্ঞানের আলোকে ফারায়েজের যৌক্তিকতা

মোঃ মোয়াজ্জেন হোসেন

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান অর্থাৎ ১ পুত্র = ২ কন্যা। কিন্তু শুধু কন্যা দুয়ের অধিক থাকলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ (/ (ভাগ, আর মাত্র একটি কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ বা ভাগ, ... (সূরা নিসা, আয়াত নং ১১)।

যোগাকর্ষন ও অনুরণন অধ্যায়ে মানবগোষ্ঠী অন্তিম বিশ্বের উন্নায়ণ পর্বে উচ্ছৃঙ্খল, বর্বর, স্বেচ্ছাচারী ও নগ্নতার আবেশে সভ্য সমাজকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে একটি স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল। পৃথিবীর মধ্যে প্রতিটি রাজ্যের তথা প্রতিটি দেশের তথা প্রতিটি মহাদেশের তথা আন্তর্জাতিক কর্ণাধারদেরকে কান ধরে উঠাচ্ছে আর বসাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাদেরও নাচাচ্ছে যেমনটি ইচ্ছা করছে। এদের খপ্পর থেকে আপামর জনগণকে বের করে আনতে পারেনি কোনো আদর্শ বা মতবাদ। দেখা গেছে যুগে যুগে একমাত্র ইসলামের নাবী-রসূলগণই সক্ষম হয়েছিলেন এহেন দুর্গম পথ পাড়ি দিতে আর সফল হতে। কষ্ট সাধ্য ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরলসভাবে ঐ মহাত্মা-মহাপুরুষগণ সমাজকে উন্নিত করে ও অসামাজিক প্রেক্ষাপটের গতিবেগে ভেসে না গিয়ে তার প্রতিরোধক হিসাবে গতিরোধ করে ছেড়েছেন। সর্বশেষ ও বিশ্ব নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্মের প্রাক্ মুহূর্তে আরব বিশ্বে দেখা দিয়েছিল জননী মহল অর্থাৎ নারী জগতকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলার প্রথা। এ বর্বরতা তাদের মধ্যে এমনভাবে বাসা বেঁধেছিল যে তারা এটাকে সম্মানের কাজ বলে মনে করত। আর ঐ যুগটিও ছিল পৌত্তলিকতার যুগ। যে পৌত্তলিকতা যুগে যুগে মহাত্মা-মহাপুরুষগণ উৎখাত করেছেন। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর অশুভ শক্তি শয়তানের প্ররোচনায়, ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে পুনরায় পৌত্তলিকতার সূচনা হয়ে যায়। অন্তিম রসূল ঐসব বর্বরতা, মানব শত্রু ও নারীদের চির দুশমনদের পরাজিত করে পৃথিবীতে ঐ নারীদের রক্ষা করেছিলেন যে সময় পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির উপর নারী মহলের কোনো অধিকার পৌত্তলিকতাবাদী সহ নাস্তিক্যবাদীরা দিত না (তাফসীরে আহসানুল বায়ান, ১১৫ পৃঃ, টীকা ১৩৮)।

নারীদের এহেন চুরি যাওয়া অধিকার জবর-দখলকারী ডাকাত দলের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করে সেই অধিকার নারীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন শেষ ও বিশ্ব রসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)। তিনি নারী জীবনের রক্ষাকবচ হিসাবে তুলনাহীন কাজ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা এই নারী মহলের মূল্যায়ন করে তাদের অধিকার চতুর্দশ শতাব্দি পূর্বে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে অর্পণ করেন। যে প্রসঙ্গে তিনি সূরা নিসার উপরোল্লিখিত ১১ নং আয়াতটিতে বলে দিয়েছেন যে, ১ পুত্র = ২কন্যা, অংশ এবং অংশ আর তারপর অবস্থা অনুপাতে বিভিন্ন অংশ বিশেষ।

এবারে চুলচেরা বিশ্লেষণে আসা যাক। আল্লাহ্ এমনটি করলেন কেন? একজন কন্যা একজন পুত্রের অর্ধেক ও দুই তৃতীয়াংশ কেন? কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এ অসামঞ্জস্য কেন? এর সদুত্তর বিজ্ঞানী মহল দেখিয়েছেন। এর উত্তর দুভাবে দেওয়া যায় — (১) সমাজ বিজ্ঞানের (Social Science) রূপরেখায়। (২) চিকিৎসা বিজ্ঞানের (Medical Science) রূপরেখায়।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.

(১) প্রথমেই দেখা যাক — সমাজ বিজ্ঞান (Social Science) কী বলে?

এই বিষয়ের ক্ষেত্রফলে আলোচনা করার জন্য নিয়ে আসা যাক আল্ কুরআনের ভায্য —

অর্থ ঃ মাতা-পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে আবার পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজেনর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক (প্রত্যেকের জন্য) নির্ধারিত অংশ (রয়েছে) (সূরা নিসা, আয়াত নং ৭)।

এই আয়াতের ১৩৮ নং টিকায় 'তাফসীরে আহসানুল বায়ান' ১১৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ''ইসলাম আসার পূর্বে একটি জুলুম এও ছিল যে, মহিলা ও ছোট শিশুদেরকে মিরাস অর্থাৎ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। বড় ছেলে, যে যুদ্ধের উপযুক্ত হত; কেবল সেই সমস্ত মালের অধিকারী হত। এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলে দিলেন যে, পুরুষদের মত মহিলা ও ছোট ছেলেমেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের মালের অংশীদার হবে, তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এটা পৃথক ব্যাপার যে, মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক (যেমন তিনটি আয়াতের পর উল্লেখ করা হয়েছে)। এতে না মহিলার উপর জুলুম করা হয়েছে আর না তার মর্যাদা খাটো করা হয়েছে, বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকার নিয়ম ন্যায় ও সুবিচারের দাবীসমূহের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মহিলাদেরকে ইসলাম জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে এবং পুরুষদের উপরেই চাপিয়েছে এ গুরুদায়িত্ব। এছাড়াও মোহর বাবদ কিছু মাল মহিলার কাছে আসে। একজন পুরুষই এই মাল তাকে দেয়। এই দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের উপর অনেক বেশি আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। সুতরাং মহিলাদের অংশ যদি অর্ধেকের পরিবর্তে পুরুষের সমান হত, তাহলে পুরুষের উপর জুলুম করা হত।"

(২) চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical Science) এর গবেষণায় কী উঠে এসেছে এবং সাথে সাথে স্বাস্থ্য বিদ্যায় (Hygiene) বা দেহ তত্ব (Physiology / Anatomy) এর বিজ্ঞানীগণ কী বলেছেন, এদিকে নজর দিলে আমরা বুঝতে সক্ষম হবো সঠিক কোন্‌টি।

এবার তুলে ধরার পালা।

হাফেজ আজিজুল ইসলাম প্রণীত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী' গ্রন্থের পৃঃ ৪৯ নং এবং ক্যারিয়ার ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম (B.Sc., T.e. & W.S.) প্রণীত 'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (সঃ)' গ্রন্থের ২য় খন্ড অনুসন্ধিৎসু পাঠক মহলকে পড়ার জন্য অনুরোধ জানাই। পুস্তক দুখানিতে উল্লিখিত হয়েছে একজন পুরুষের দৈহিক পরিকাঠামোর সাথে একজন নারীর দৈহিক পরিকাঠামোর বাহ্যিক মিল থাকলেও কিছু বাহিক্য পার্থক্য ও আভ্যন্তরীণ পার্থক্য বিদ্যমান তা সাধারণ মানুষের চোখকে ফাঁকি দিলেও কিন্তু বিজ্ঞানীদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তাই আপাতদৃষ্টিতে ৩৩টি পার্থক্য দেখতে পাওয়া গেছে। এই পার্থক্যগুলিকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায় — (ক) দিব্য চাক্ষুসমান প্রধান পার্থক্য, (খ) দিব্য চাক্ষুসমান অপ্রধান পার্থক্য ও (গ) আভ্যন্তরীণ অচাক্ষুসমান পার্থক্য।

(ক) দিব্য চাক্ষুসমান প্রধান পার্থক্য ঃ— যৌনাঙ্গ, দাড়ি, গোঁফ ও বক্ষস্থল।

(খ) দিব্য চাক্ষুসমান অপ্রধান পার্থক্য ঃ—

(১) পুরুষ শরীর গতিশীল ও সৃজনশীল এবং নারীর শরীর স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল।

(২) পুরুষ শরীরের আকৃতি থেকে নারীর আকৃতি ছোট।

(৩) পুরুষ সবল এবং নারী দুর্বল। অনুপাত দাঁড়ায় ৩:২।

(৪) পুরুষের সম্মুখ দিক ভারী এবং নারীর পিছন দিক ভারী। তাই পুরুষ শবদেহে উপুড় হয়ে ভাসে এবং নারীর চিৎ হয়ে ভাসে। নারী হাইহীল জুতো পরে স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটতে পারে যা পুরুষ দ্বারা সম্ভব নয়।

(৫) পুরুষ বলবীর্যবান ও শক্তিশালী এবং নারী কোমল ও লাজুক।

(৬) পুরুষ সাধারণতঃ চঞ্চল এবং নারী ধীর স্থির।

(৭) পুরুষ সাহসী আর নারী ভীরু।

(৮) পুরুষ উন্নতদেহী ও প্রশস্ত বক্ষ আর নারীর স্বাভাবিক ও স্তনযুগল।

(৯) পুরুষ চিন্তাশীল ও ভাবুক আর নারী স্বভাবধর্মী ও পরশ্রীকাতর।

(১০) পুরুষের চিন্তাধারা জাগ্রত ও বিপ্লবী আর নারীর সুপ্ত ও সাম্য।

(১১) পুরুষ আলোড়নকারী আর নারী প্রেরণাকারী।

(গ) আভ্যন্তরীণ অচাক্ষুসমান পার্থক্য যা সাধারণ চোখে দেখা যায় না। ঐ পার্থক্যগুলি দেখতে গেলে বিভিন্ন প্রকারের শক্তিশালী যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সাথে সাথে বিজ্ঞানীদের চোখের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ব্যাপার এটা। তাঁরা কী পার্থক্য দেখিয়েছেন দেখা যাক—

(১) পুরুষ ক্ষারধর্মী এবং নারীরা অম্লধর্মী।

(২) পুরুষ শরীর বিদ্যুৎধর্মী আর নারীরা চুম্বকধর্মী।

(৩) পুরুষের দৈহিক ওজন ১৪৩ পাউন্ড আর নারীর ১২৮ পাউন্ড।

(৪) পুরুষের দেহের মাংসপেশী ৪১.৫% এবং নারীর ৩৫%।

(৫) পুরুষের দেহের হাড়ের ওজন সাধারণত ৭ সের আর নারীর ৫.২৫ সের।

(৬) পুরুষের দেহে ১৮% চর্বি আর নারীর ২৮%।

(৭) পুরুষের দেহে জলীয় অংশ কম এবং নারীর বেশি।

(৮) পুরুষের রক্তের লোহিত কণিকা ১ কিউবিক মি.মিটারে ৫০ লক্ষ এবং নারীর ৪৫ লক্ষ।

(৯) পুরুষের মগজের ওজন গড়ে ৪৯.৫ আউন্স আর নারীর ৪৪ আউন্স। পুরুষের সর্বনিম্ন ৩৪ আউন্স, সর্বোচ্চ ৬৫ আউন্স; নারীর সর্বনিম্ন ৩১ আউন্স, সর্বোচ্চ ৫৪ আউন্স।

(১০) পুরুষের মস্তিষ্কে মগজের সাথে লঘু মস্তিষ্কের সম্পর্ক ১ ঃ ৮ $\frac{(}{(}$ এবং নারীর ১ঃ ।

(১১) পুরুষের মগজ তার শারীরিক ওজনের তুলনায় ভাগ এবং নারীর ভাগ।

(১২) পুরুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তিশালী এবং নারীর দুর্বল।

(১৩) পুরুষ ঘ্রাণ শক্তি প্রবল অর্থাৎ ১ অংশ এবং নারীর কম অর্থাৎ অংশ।

(১৪) পুরুষের মগজের বক্রতা ও প্যাঁচ বেশি এবং নারীর অনেক কম।

(১৫) পুরুষের মগজের স্নায়ুমনি বেশি এবং নারীর কম।

(১৬) পুরুষের হৃপিন্ডের ওজন নারীর হৃৎপিণ্ডের ওজনের চেয়ে ৬০ ড্রাম বেশি।

(১৭) পুরুষের নাড়ীর স্পন্দনের চেয়ে নারীর নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ৫টি বেশি।

(১৮) পুরুষ শ্বাস প্রশ্বাসে ঘণ্টায় ১১ ড্রাম কার্বন জ্বালাতে পার আর নারী পারে ৬ ড্রাম। এখানেই বুঝা যায় নারী দেহে অক্সিজেনের ভাগ কম।

এতগুলো পার্থক্য ব্যতিরেকেও বিজ্ঞানী মহল আরও তাঁদের সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে এগোবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অকৃতকার্যতা স্বত্বেও ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে এগিয়ে যেতে থাকা বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন আরও কিছু পার্থক্য, যা মানুষকে হতবাক করার মত। দেখি, তাঁরা কী আবিষ্কার করলেন মানুষের কল্যানার্থে। 'সাপ্তাহিক কলম' পত্রিকায় ২০০০ সালের ২রা -৮ই জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ বাবলুল ইসলাম তুলে ধরলেন আরও কিছু পার্থক্য। যেমন —

(১) পুরুষের হৃৎপিণ্ডের ওজন ২৮০-৩৪০ গ্রাম আর নারীর ২৩০-২৮০ গ্রাম।

(২) পুরুষের যকৃতের ওজন ১.৪-১.৮ কিগ্রা এবং নারীর ১.২-১.৪ কিগ্রা।

(৩) পুরুষের বৃক্কের ওজন ১৫০ গ্রাম এবং নারীর ১৩৫ গ্রাম।

(৪) পুরুষের ডান ফুসফুসের চেয়ে নারীর ৬২৫ গ্রাম. কম।

(৫) পুরুষের বাম ফুসফুসের চেয়ে নারীর ৫৬৫ গ্রাম কম।

(৬) পুরুষের মস্তিষ্কের সেরেবেলামের চেয়ে নারীর ১৫০ গ্রাম কম।

(৭) পুরুষের মস্তিষ্কের সেরিব্রানের চেয়ে নারীর ১২০০ গ্রাম।

(৮) পুরুষের লোহিত কণিকা ১ কিউবিক মি.মি. রক্তে R.B.C. ৪.৫ - ৬.৫মিলিয়ান এবং নারীর ৩.৫-৫.৫ মিলিয়ান।

(৯) পুরুষের হিমোগ্লোবিন ১৩-১৮ গ্রাম এবং নারীর ১০-১৬ গ্রাম।

(১০) পুরুষের এ্যাসিড (আউটপুট) ১-৫ মি.গ্রা. এবং নারীর ০.২- ৩.৮ মি.গ্রা।

(১১) পুরুষের অসুখ তুলনামূলক কম এবং নারীর বেশি (রোগ প্রবণতা অনুসারে)।

(১২) পুরুষের ই.এস.আর (E.S.R.) তুলনামূলক কম এবং নারীর বেশি (রোগ প্রবণতা অনুসারে) (পুরুষের প্রতি ঘণ্টায় ২-৫ মি.মি এবং নারীর ১০-১২ মি.মি.)।

এবার আসি 'সাপ্তাহিক কলম' পত্রিকার ২০০০ সালের ২৩-২৯শে জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত অসমের শিলচর মেডিকোল কলেজের এম.বি.বি.এস কোর্সের শেষ বর্ষের ছাত্র ডাঃ মুসাউর রহমান মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধের 'মানুষের শরীরে কিডনী স্টোন কী ও কীভাবে এর সৃষ্টি' শিরোনামে মন্তব্য ''পুরুষ মানুষের কিডনী স্টোন হওয়ার প্রবর্ণতা নারীদের থেকে ৪ গুণ বেশি।''

পৃথিবীর যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রফল ও ফলাফল নির্ভরশীল হয় দুটো শক্তির উপর ভিত্তি করে। (১) মেধা শক্তি (২) দৈহিক শক্তি। আর এই উভয়বিধ শক্তিকে চালিত করে মনন শক্তি। পৃথিবীর যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রফলের মধ্যে এটি একটি, যেটি পিতা-মাতার মৃত্যান্তে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও সম্পদে উভয়ের উত্তরসূরীদের মিরাস বন্টন অর্থাৎ ফারায়েজ; যাকে অঙ্কের ভাষায় বলা হয় ভগ্নাংশ। এই মিরাস বন্টন পদ্ধতিটি সমতা বজায় রাখে তার দৈহিক শক্তির উপর। এই দৈহিক শক্তি তৈরি হয় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয় সাধনে ও যৌগ প্রতিক্রিয়ায়।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও এমন কিছু পদার্থ এবং বস্তু রয়েছে যা দেহের যৌগ প্রতিক্রিয়ায় সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয়।

যেমন - পোশাক অর্থাৎ কাপড়ের গুণাগুনের মধ্য দিয়ে দৈহিক শক্তি ঘাটতি পূরণ সহ উন্নতি-অবনিত; খাদ্যের গুণাগুণের দ্বারা শারীরিক ক্ষমতার ঘাটতি পূরণ সহ উন্নতি-অবনতি; সূর্যরশ্মি, বায়ুমণ্ডলীয় রশ্মি, মহাকাশীয় রশ্মির গুণাগুণের মাধ্যমে দেহের ঘাটতি পূরণ সহ উন্নতি-অবনতির পথ পরিক্রমা করে থাকে। উন্নতি-অবনতির অপর নাম বাড়া-কমা। তেমনিভাবে দৈহিক শক্তির পরিকাঠামোর ভিত্তিতে সামাজিক এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে উঠে আসা নরনারীর দেহাভ্যন্তরে পার্থক্যের ভীত গড়ে উঠে মিরাস বন্টনের পার্থক্য। এটাই হল আল্লাহ্‌র সৃষ্টি তত্ত্বের গুপ্ত রহস্যের একটি অমোঘ উদাহরণ। নর-নারীর দৈহিক পরিকাঠামোগত পার্থক্যটিই প্রমাণ করে দেয় মিরাস বন্টনের স্বরূপ ও পদ্ধতি কীরূপ হতে পারে। ১ জন পুরুষ = ২ জন মহিলা (কন্যা), এই প্রতিক্রিয়াই বন্টনের সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও সঠিক সমাধান বলে আল্লাহ্‌ই তাই করেছেন।

উপরোল্লিখিত সমাজ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান এর তথ্যানুযায়ী সর্ব স্রষ্টা আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে সর্বোত্তম আকৃতিগত সৌন্দর্যের অধিকারী মনুষ্য নর-নারীর দেহ সৌষ্ঠবকে একে অপরের পরিপূরক করলেও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন বহু পার্থক্যের বিনিয়োগে। এটাও চরম সত্য। আর এই সত্যতাই প্রমাণ করেছে অংশীদারত্বের ব্যবধান জনিত ভূমিকাকে। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন তাঁর সৃষ্টি মানুষের সার্বিক কল্যাণ কী কী করলে হবে, কীভাবে করলে হবে। আর তিনিই সব সমস্যার সমাধান পূর্বকল্পিত ভাবেই করেছেন।

আরও একটা মহাকাশীয় চলন্তমান ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরছি যা শরীরের আয়ুতে প্রভাব ফেলে চলেছে বহির্বিশ্বের সৌর শক্তি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দ্যা ভয়েস অব ওয়াদি' ২০১৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী সংখ্যায় 'আয়ুতে সূর্যের প্রভাব' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ হয়। তাতে বলা হয়েছে — ''মানুষের আয়ুষ্কালের উপর সূর্যের সক্রিয় প্রভাব রয়েছে বলে একে গবেষণায় দাবি করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এ.এফ.পির প্রতিবেদন জানানো হয়, 'প্রোসেডিংস অব দ্য রয়েল সোসাইটি বি' নামের একটি সাময়িকীতে এ সংক্রান্ত গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে।

নরওয়েজিয়ান ইউনির্ভাসিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড লেকোলজির একদল গবেষক এ গবেষণাটি করেছেন। গবেষণার ভিত্তি ছিল সূর্য পর্যবেক্ষণ ও মানুষের জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের তথ্য সন্ধান।

গবেষক দলটির দাবি, সূর্য অশান্ত থাকা অবস্থায় জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের চেয়ে সূর্য শান্ত থাকাকালে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের আয়ুষ্কাল বেশি হয়। জন্ম সময় ভেদে এই দুই শ্রেণির মানুষের মধ্যকার আয়ুষ্কালের গড় ব্যবধান পাঁচ বছর।

অর্থাৎ সূর্য শান্ত থাকাকালে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের আয়ুষ্কাল অন্যদের চেয়ে পাঁচ বছর বেশি। গবেষকরা আরও দাবি করেন, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ওপর সূর্যের সক্রিয়তার প্রভাব বেশি।

এখানেও দেখা গেল, সূর্য শান্ত-অশান্তের কারণে মানুষের শরীরে প্রভাব ফেলার জন্য বয়সের তারতম্য ও ব্যবধান যদি ফুটে উঠতে পারে তাহলে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পার্থক্যের দরুন কেন তার মিরাস বন্টনে প্রতিফলন ঘটবে না? ঘটাটাই স্বাভাবিক। ফলে প্রশ্ন চিহ্ন ঐ ভাবুক মনের মানুষদের কাছে।

যারা বিষদগার করেন ইসলামের মিরাস বন্টন পদ্ধতির ব্যাপারে তাঁরা উপর উপর ভাসমান পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করে ফেলেন। কিন্তু এভাবে মন্তব্য করা কোনো মতেই সমীচীন নয় বলে আমি মনে করি। বিজ্ঞানীদের চোখের দ্বারা এর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও চিরুনি তল্লাশি করলেই বাস্তবতার রূপরেখা পরিগ্রহ হতে বাধ্য। তারপরে মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়ার পালা এসে যায়। তা না হলে 'পানি না দেখেই মোজা খোলা'র প্রবাদটি মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

তাই, আসুন সকল বুদ্ধি-বৃত্তি সম্পন্ন উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মানুষ সর্ব স্রষ্টা আল্লাহ্‌র পবিত্রতম বাণীগুলি সঠিকভাবে বুঝে তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে আসি — আমীন।

৬ষ্ঠ পর্ব

উজ্জ্বল মোতিসমূহের সোনালী উপহার

মূল ঃ শাইখ হাফেয যুবায়ের আলী যায়ীর গ্রন্থাবলী (উর্দূ)
সংকলন ও অনুবাদ ঃ আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী

(১১) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কি আল্লাহ্ তাআলার নূরের অংশ বিশেষ?

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রসূল হওয়ার সাথে সাথে নাবী আকরাম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একজন মানুষ ছিলেন, যেরূপ কুরআন, মুতাওয়াতির (পারস্পরিক সনদ সুদৃঢ়) হাদীসসমূহ এবং ইজমা থেকে প্রকাশিত।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ আমি তো মানুষ (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬৯৬৭, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৭১৩)।

আম্মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মানুষ সমূহের মধ্যে একজন মানুষ ছিলেন।

(ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হাঃ ৫৪১ এবং এর সূত্র সহীহ্, লাইসে এর কাতেব (লেখক) আব্দুল্লাহ্ ইবনে স্বালেহ থেকে ইমাম বুখারীর বর্ণনা সহীহ্ এবং হিব্বানের নিকট তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু অহব তাঁর সহায়ক, আল এহসান হাঃ ৫৬৪৬, দ্বিতীয় নুসখা হাঃ ৫৬৭৫)।

সমস্ত স্বাহাবী এবং তাবেঈগণের এই আক্বীদাই ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর সন্তান এবং মানুষ ছিলেন। কোনো একটি আয়াত অথবা (গ্রহণযোগ্য) হাদীস থেকে তাঁর মনুষত্বের খণ্ডন প্রমাণিত নয়। ইংরেজদের যুগের সৃষ্টি ব্রেলবী ফির্কার প্রসিদ্ধ বই 'বাহারে শারীয়াতে' লিপিবদ্ধ আছে যে, 'আক্বীদাহ্' ঃ নাবী সেই মানুষকে বলা হয় যার প্রতি আল্লাহ্ তাআলা হিদায়াতের জন্য অহী প্রেরণ করেছেন এবং রসূল মানুষের সাথেই নির্দিষ্ট নয় বরং ফেরেশতাদের মধ্যেও রসূল আছেন।

আক্বীদাহ - সমস্ত নাবীগণ মানুষ এবং পুরুষ ছিলেন, না কোনো জিন নাবী হয়েছে না কোনো মহিলা (হিস্বস্বা আওয়াল ৭ পৃঃ)। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মানুষ হওয়ার সাথে সাথে রসূল, নাবী এবং হিদায়াতের নূর (আলো) ও ছিলেন, কিন্তু এ কথা বলা যে, তিনি মানুষ ছিলেন না বরং নূরুম মিন নূরিল্লাহ্ অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল্লাহ্র নূরের অংশ বিশেষ, কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত এবং বাতেল আক্বীদাহ্ এবং একথা বলাও ভুল যে, তিনি নূরের তৈরি সৃষ্টি জীব ছিলেন যিনি মনুষ্যত্বের পোশাকে দুনিয়ায় এসেছিলেন, কারণ এই আক্বীদারও কোনো দলীল নেই।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনিল আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর থেকে যা কিছু শুনতাম সবকিছু লিখে নিতাম, আমি তা মুখস্ত করতে চাইতাম (কিন্তু) কুরাইশের লোকেরা আমাকে বাধা প্রদান করলো এবং বলল, 'তুমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছ থেকে শুনে সব কথা লিখে নিচ্ছ অথচ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হলেন একজন মানুষ, কখনো রাগের অবস্থায় থাকেন আবার কখনো আনন্দের অবস্থায় থাকেন"। ফলে আমি লিখা ছেড়ে দিলাম অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছে সে কথা বর্ণনা করলাম। তিনি নিজের মুখের দিকে তাঁর অঙ্গুলির ইশারা করে বললেন—

فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ.

লিখো ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। তা থেকে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বের হবে না (সুনানে আবী দাউদ হাঃ ৩৬৪৬, মুসনাদ আহমাদ ২/১৬২ হাঃ ৬৫১০, মুসান্নাফ ইবনু শাইবাহ্ ৯/৪৫, ৫০, মুসনাদ দারিমী হাঃ ৪৯০ এবং তাঁর সূত্র সহীহ)।

বুঝা গেল যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) গণের এটা সম্মিলিত আক্বীদাহ্ ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একজন মানুষ।

পক্ষান্তরে এটাও অনস্বীকার্য সত্য যে, রসূল (সল্লাল্লাহু

আলাইহি অ সাল্লাম) হলেন হিদায়াতের নূর যেমনটা — قَدْ جَائَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَ كِتَابٌ مُبِيْنٌ অর্থঃ অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে (সূরামায়িদাহ্ ৫/১৫)। এর তাফসীরে হাফেয আবূ জা'ফার ইবনু জারীর আত্তাবারী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন —

يعنى بالنور محمدا ﷺ الذى أنار الله به الحق و أظهر به الاسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به ....

অর্থঃ এখানে নূর থেকে বুঝানো হয়েছে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা সত্যকে আলোকিত এবং স্পষ্ট করেছেন, আর তাঁর দ্বারা ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। মক্কা, মদীনা এবং আরব উপদ্বীপ থেকে শিরককে নিশ্চিহ্ন করেছেন, ফলে তিনি হলেন সেই ব্যক্তির জন্য নূর যে তাঁর থেকে নূর হাসিল করতে চায় (তাফসীর জারীর তাবারী ৬/১০৪)। অর্থাৎ তিনি হলেন বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়াতের জ্যোতি এবং সারা বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অয়া-লিহি অ সাল্লাম)।

কিছু লোক তাঁকে আল্লাহ্‌র সত্তার একটা অংশ ধারণা করে এবং নূরুম মিন নূরিল্লাহ্-র বিশ্বাস রাখে, যদিও এ বিশ্বাস কুরআন ও দ্বীনে ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী (সূরা যুখরুফ ৪৩/১৫)।

পরিশেষে প্রাসঙ্গিক সংযোজন হিসাবে পেশ করছি যে, চিশতীদের খত্বীব গোলাম মোহর আলী ব্রেলুভী লিখেছেন, "আমাদের আক্বীদার বিশ্লেষণ হল এই যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্‌র তৈরি করা নূর" (ফাতাওয়া সানাইয়া প্রথম খণ্ড ৪৩৭ পৃঃ)। আমি বলি, আমাদেরও বিশ্বাস এটাই। তবে আমরা অর্থাৎ আহ্‌লে সুন্নাত অল-জামাআতেরা 'হুযুরকে পুরানো নূর বা আল্লাহ্‌র অংশ মানি' এটা মিথ্যা রটনা এবং প্রকাশ্য অপবাদ। যার শাস্তি কিয়ামত দিবসে দেউবন্দী এবং অহাবীরা অবশ্যই পেয়ে যাবে। আমরা কেবল এটাই বলে দেব, "মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত" (দেউবন্দী মাযহাব ২৪৩ পৃঃ)।

ব্রেলুভী ফির্কার নিজেদের আহ্‌লে সুন্নাত অল-জামাআত বলা সম্পূর্ণ ভুল, কিন্তু তাঁদের নিকট আবেদন তাঁরা যেন উক্ত আক্বীদায় তাঁদের সাধারণদের সংশোধন করে নেন এবং অন্যান্য বাত্বেল আক্বীদাসমূহে তওবা করে নিজেদেরও সংশোদন করে নেন (তাহ্‌ক্বীক্ব, ইসলাহী আউর ইলমী মাক্বালাত ৪/৫৫৫-৫৫৭)।

পরিশিষ্ট ঃ হাফেয যুবায়র আলী যাঈ অন্য এক স্থানে নূরে হিদায়াত শিরোনামে লিখেছেন, ইরবায ইবনু সারিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি —

اِنِّى عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ بِخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَ اِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِى طِيْنَتِهِ ، وَ سَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذٰلِكَ : دَعْوَةُ أَبِى اِبْرَاهِيْمَ، وَ بَشَارَةُ عِيْسَى، وَرُؤْيَا أُمِّىَ الَّتِى رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَائَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ.

অর্থাৎ ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকটে সর্ব শেষ নাবী লিখিত ছিলাম এবং আদম (আলাইহিস্ সালাম) নিজের মাটিতে মাখানো ছিলেন। অর্থাৎ আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর শরীরে রূহ দেওয়া হয়নি এবং আমি তোমাদেরকে এর পূর্বের কথা বলব ঃ আমি আমার আব্বা ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর দুআ এবং ঈসা (আলাইহিস্ সালালম) এর সুসংবাদ এবং যখন আমার জন্ম হল আমার মা স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর শরীর থেকে একটি নূর বের হ'ল যার কারণে শামের প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেল (সহীহ্ ইবনু হিব্বান, আল-ইহসান হাঃ ৬৩৭০, আন্ নুসখাতুল মুহাক্বাক্বাহ্ ১৪/৩১৩ হাঃ ৬৪০৪, সূত্র হাসান, হাদীসটিকে হাকেম সহীহ্ বলেছেন ২/২১৮ হাঃ ৩৫৬৬ এবং যাহাবী তাঁর সমর্থন করেছেন / আব্দুল আলা ইবনু হিলালকে ইবনু হিব্বান, হাকেম এবং অন্যান্যরা আস্থাভাজন রাবী বলেছেন। ফলে তাঁর হাদীস হাসান থেকে নিম্নস্তরের হবে না)।

আমি এবং আমার মা-বাপ, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্য কুরবান হতে প্রস্তুত, অবশ্যই তিনি হিদায়াতের নূর।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর শাফাআত পেয়ে ধন্য হওয়ার তাওফীক দাও — আমিন। (তাহ্‌ক্বীক্বী, ইসলাহী আউর ইলমী মাক্বালাত ২/৫৫৬-৫৫৭)।

ত্রাহি ডাক

মোসাঃ সামিম সুলতানা

অসহায়ের সহায়, দুঃখে-শোকে, বিপদে আপদে সহায়ক আল্লাহ্। বান্দার বিপদে আকুল আবেদন, কাকুতি-মিনতি মনের বেদনা শ্রবণ করেন ও জানেন একমাত্র তিনিই। তিনিই দুঃখীর দুঃখ, শোকার্তের শোক, বিপন্নের বিপদ, বেদনার্তের বেদনা দূর করে থাকেন। তিনিই সুখীকে সুখ, সম্পদশালীকে সম্পদ প্রদান করেন। তাঁর এ কাজে কেউ শরীক, সহায়ক বা সুপারিশকারী নেই। বান্দার আহ্বানে সাড়া দেন। আবেদন মঞ্জুর করেন। তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী (কুরআন ২/১০০)। তাঁকে ডাকার জন্য, পাবার জন্য, তাঁর সাহায্য, দয়া বা অনুগ্রহ লাভের জন্য কোনো উকিল, অসীলা বা সুপারিশকারীর প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় শুধু তাঁর ইচ্ছার। তিনি ছাড়া কোনো ফেরেশতা, নাবী, অলি, জিন কেউই দুআ মঞ্জুর করতে পারবে না, আর না পারবে কারোর মনের আকাঙ্খা মিটাতে। তাই বিপদে তাঁকে ছেড়ে কোনো গায়রুল্লাহ্‌কে ডাকা, তার কাছে বিপদের কথা জানিয়ে সাহায্য চাওয়া শির্কে আকবার (কুরআন ৩৯/৩৮, ৭/১৯৭)। অবশ্য এমন কোনো বিপদে পড়া যা থেকে উদ্ধার করা জীবিত কোনো মানুষের সাধ্যে আছে, তবে তাকে আহ্বান করা কোনো শির্ক নয়। যেমন ডুবন্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষার জন্য, কোনো হিংস্র জন্তু বা শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য, কোন জীবন্ত সক্ষম উপস্থিত ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া এবং তাকে 'বাঁচাও' বা 'রক্ষা কর' বলে ডাকা শির্ক নয়। যদি তাকে বাঁচার অসীলা মনে না করে, কেবল আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা রাখা যায়। মুমিনের মনে স্মরণীয় শুধু আল্লাহ্। মুমিন শুধু তাঁরই যিকর করে তাঁরই শাস্তিকে ভয় করে। তাঁরই নিকট সাহায্য চায়। অন্য কোনো নাবী, অলী (পীর-ফকির) তার স্মরণীয় নয়। তাদের যিকরও করে না সে তাদের স্মরণে কোনো লাভ হয় বলে মনেও করে না। তাদের কোনো গযবকে (গযব হয় ও না) ভয়ও করে না। তাদের নিকট কোনো সাহায্যও চায় না। মুসলিম কোনো কবরবাসীর নিকট কিংবা কোনো বুযুর্গের নিকট কিংবা কোনো ফেরেশতা বা জিনের নিকট সাহায্য চায় না, বিপদ হতে উদ্ধার বা সান্ত্বনা প্রার্থনা করে না। চায় তো শুধু তাঁরই কাছে, যিনি দান করে থাকেন। সুতরাং যদি কোনো মুসলিম স্বলাত, সিয়াম করা সত্বেও মসিবতে মৃতকে ডাকে অথবা জীবন্ত কোনো বুযুর্গের বা কোনো জিন, ফেরেশতা, আলি, ফাতেমা বা হাসান হুসাইনের এমন কাজে সাহায্য চায় যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই উদ্ধার করতে সক্ষম নয় এবং তাকে নসীহত করা সত্বেও সে অবজ্ঞা করে অদম্য মনে সেই কাজে লিপ্ত থাকে এবং সেই অবস্থায় তার মৃত হয়, তবে সে মুশরিক হয়ে ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে মারা যায়। জ্ঞানী মুসলিম জানে, দুআ বা প্রার্থনা করা হয় তাঁর কাছে। এ সমস্ত গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তিনি ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা যাবে না। তাই তো তাঁর কাছে কিছু না চাইলে তিনি রাগান্বিত হোন (মিশকাত ২২৩৮)। আবার মানুষের কাছে চাইলে তিনি রাগান্তিত হোন। তাই তো জ্ঞানী তারাই যারা তাঁর কাছে চায়, যিনি এ বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর কেউ শরীক বা অংশী নেই। আর জানে যে, আল্লাহ্‌র নিকটে নাবী, অলীর মর্যাদা থাকলেও তাঁরা তার কোনো কাজে সহায়ক নন এবং কারো জন্য নিজের ইচ্ছায় সুপারিশকারীও নন (কুরআন ১৭/৬৫, ৩৪/২২-২৩)।

অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়

মোঃ মোহসিন আলী আঞ্জুম

হাজারো রকমের ছলে-বলে-কৌশলে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে শেষ পর্যন্ত সদর্পে ভেঙে ফেলে দিয়ে সেখানে সদম্ভে পূজোপাঠ চালু করতে সফল হওয়ার পর, এখন আবার সশক্ত সংঘ পরিবারের স্বয়ম্ভ ইতিহাস শাখার আরও এক অদ্ভূত ও আশ্চর্যজনক দাবির বিস্ময়কর আওয়াজে গোটা ভারতবর্ষপ্রকম্পিত হয়ে উঠেছে, ''তাজমহল মসজিদে স্বলাত বন্ধ হোক! নতুবা সেখানে চলবে শিবের প্রার্থনাও''।

— কিন্তু কেন? তাদের দাবি যে, একটি শিব মন্দির ভেঙেই সেখানে বাদশা শাহজাহান তাঁর প্রয়াত স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মৃতিতে বানিয়েছিলেন সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল। ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ তাদের এই মিথ্যা দাবিকে মানতে অস্বীকার করলেও সংঘ পরিবারের নিজস্ব ইতিহাস শাখা তাদের দাবির স্বপক্ষে উপস্থাপন করেছে অন্য এক দলীল-দস্তাবেজ। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর ২৮ অক্টোবর সংখ্যার ভাষায় ''তাদের হাতিয়ার ১৯৮৯-এ লেখা ঐতিহাসিক পি.এন. ওকের একটি বই। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, ভারতে মুসমিলদের আসার অনেক আগে ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'তেজো মহালয়া' নামে একটি শিব মন্দির ছিল। তাজমহল তাঁরই অপভ্রংশ। যদিও ওই ব্যক্তি 'ভিত্তিহীন' নানা তত্ত্বের জন্য কুখ্যাত। ওক এমনও দাবি করেছিলেন, হিন্দুরা এক সময়ে ইতালি জয় করেছিল, এমনকী লণ্ডনের ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবেও নাকি একসময় শিব মন্দির ছিল।''

উল্লেখ্য যে, স্বলাত তাজমহলের আঙিনায় পড়া হয় না, হয়ে থাকে তাজমহলেরই পাশে অবস্থিত মসজিদে। স্বলাত আদায়কারীদের সুযোগ সুবিধার জন্য শুধুমাত্র শুক্রবার জুম্মার দিবসেই বন্ধ থাকে তাজমহল পরিদর্শন। সরকার ও প্রশাসনের অনুমতিতেই এ রীতি বহুকাল হতে অব্যাহত রয়েছে। কোনোদিন কোনো ফ্রন্ট হতে কোনো প্রকারের আপত্তি ওঠেনি। ওঠবার কথাও নয় — কারণ স্বলাত মানেই সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ আগমন প্রস্থান। মিথ্যুক পি.এন ওকের মনগড়া ইতিহাসকেও কেউ কোনোদিন অনু পরিমাণও আমল দেয়নি, বরং দেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের সকলেই তাঁর অশ্রুতপূর্ব, অবাস্তব কথাগুলোকে 'পাগলের প্রলাপ' বলেছেন। কিন্তু এই প্রথম দেখা যাচ্ছে - আর.এস.এস.-এর স্বয়ম্ভু ইতিহাস পরিষদ ডাহা মিথ্যাকেও সত্যে পরিণত করার জন্য সুযোগ বুঝে গায়ের জোর খাটাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাজমহল এবং তৎসংলগ্ন মসজিদ - উভয়কে তারা এক অভিন্ন ঘোষণা দিয়ে সেখানে শিবের পূজোপাঠ চালু করার হুমকি দিয়েছে। বেচারা মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, ''ওখানে শিব পূজা করতে দেওয়া উচিত হবে না, কারণ তাজমহল ও মসজিদ এক অভিন্ন নয়। মসজিদ রয়েছে পাশের ভিন্ন জায়গায় - তার সাথে তাজমহলের কোনো লেনাদেনা নেই। কিন্তু শঠ কি শোনে কভু সত্যবাদীর কথা? সংঘের সর্বশক্তিধর নেতা বাল মুকুন্দজী বলেছেন - মুসলমান শাসকদের নির্দেশে বহু ধ্বংস হওয়া হিন্দু স্থাপত্যের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে ... শুক্রবারের স্বলাত তাজমহলের পাশে অনতিবিলম্বে বন্ধ না হলে আমরা সেখানে শিবের পূজাপাঠ শুরু করবোই করবোই। বোঝা গেল যে, দেশের অন্যত্রও অবস্থিত ঐতিহাসিক মসজিদগুলোতেও মিথ্যা ইতিহাসের বাহানায় শিব-পার্বতী-গনেশ-মহেশ প্রভৃতি দেবদেবীদের পূজার্চনা ভবিষ্যতে জোরপূর্বক চালু হওয়ার সম্ভাবনাও বিস্তর। অর্থাৎ সত্য ইতিহাস চুলোয় যাক, রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন যার মুঠির মধ্যে তখন তার পক্ষে 'মাইট ইজ রাইট' প্রবাদ বাক্যই সর্বাংশে সত্য। এটাও কি কম বড়ো সন্ত্রাসবাদী মনোবৃত্তির পরিচায়ক?

খবরে প্রকাশ, 'কয়েকদিন আগে হিন্দু যুব বাহিনী' নামে এক দক্ষিণপন্থী সংগঠন তাজমহলে শিব চালিশা পাঠ করে। জোর করে তাদের সরাতে হয়। পুলিশ গ্রেফতার করতে গেলে ক্ষমা চেয়ে পালায় তারা। তাদের দাবি ছিল তাজমহল আসলে শিবমন্দির। ভবিষ্যতে যাতে এই অবাঞ্ছিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্যই নাকি প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আগ্রায় স্বয়ং তাজমহলের ক্ষত মেরামতিতে নামেন। তিনি হাজির হয়ে ঘোষণা দেন, 'তাজমহল ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অভিন্ন অঙ্গ।' এতে নাকি তার নিজেরও 'তাজ' সুরক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর জন্য এবং মহামান্য মোদীজীর জন্যও চরম দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের বেপরোয়া নেতারা ঘোষণা করেন, 'তাজমহল আসলে শিব মন্দির, তাকে কবরখানার চেহারা দেন বাদশা শাহজাহান। অতএব সেখানে স্বলাত বন্ধ না হলে শিবের প্রার্থনা শুরু হবেই। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন, প্ররোচনা

ও উত্তেজনামূলক বিবৃতি দাতাদের বিরুদ্ধে মোদীজী অথবা যোগীজী শুরুতেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস দেখাবেন কি? অভিজ্ঞতা বলে যে, না, কোনো মতেই না। কেননা যতদিন হতে কেন্দ্রে এবং কিছু কিছু রাজ্যে 'ভাজপা' সরকার গঠিত হয়েছে ততদিন থেকে সংঘ পরিবারের সমস্ত শাখা প্রশাখা দেশের দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিম ও খ্রিস্টানের ধর্ম-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তাই এভাবে আবোল-তাবোল উত্তেজক কথা-বার্তা ও অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে অথচ প্রাদেশিক অথবা রাষ্ট্রীয় সরকার নিরপেক্ষভাবে তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণই করেনি। ফলে দুষ্টদের বুকের পাটা আরও প্রশস্ত হয়ে চলেছে, অন্যদিকে দুর্বল-নিরুপায় শিষ্ট শান্তদের মধ্যে দিনানুদিন অবিশ্বাস ও হীনমন্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষতঃ দেশের মুসলিম সম্প্রদায় মোদী-যোগী যুগে স্বাধীনতার পরে সর্বাধিক অনাস্থা-অবিশ্বাস ও মন-মরা অবস্থায় জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে।

'প্রতিদিন' এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, ''আসলে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে পুঁজি করে আমাদের দেশে সব সময়ই একটি শক্তি ইতিহাস বদলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এসেছে। ইতিহাস নতুন করে লেখার সুযোগ থাকে, কিন্তু তাই বলে ইতিহাসকে বদলে দেওয়া যায় না। যেটা ঘটেছে সেটাকে স্বীকার করতেই হয়ে।''

অতএব সর্বাংশে সত্য ইতিহাসের আলোকে স্বীকার করতেই হবে যে, (ক) এদেশে প্রায় সাড়ে ছ শ বছর অব্যাহতভাবে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা সত্বেও একজন ভারতীয়কেও জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা হয়নি। যারা ঝাঁকে ঝাঁকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তারা ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে জাতি-বর্ণ গোত্রের নামে অত্যাচার মওজুদ থাকার কারণেই আত্মরক্ষার জন্য সানন্দে ও সোৎসারে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এ কথা সংঘ পরিবারের নমস্য মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দও সর্বান্তকরণে স্বীকার করেছেন। (খ) মুসলিম আমলে এদেশে একটিও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়নি — একথা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণির ঐতিহাসিকরাও সানন্দে স্বীকার করেন। (গ) কোথাও কোনো মঠ, মন্দির, আশ্রম ভেঙে ফেলে তথায় মসজিদ-মাদ্রাসা বানানো হয়নি। হিন্দু সমাজে অতিশয় কট্টর ও গোঁড়া নামে পরিচিত মুসলিম বাদশা ঔরঙ্গজেবের যুগেও এমন ইসলাম বিরোধী ঘটনা কোথাও ঘটেনি, ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে যে, তবে কেন ভারতীয় ইতিহাসকে নতুন ভাবে লেখার জন্য সংঘ পরিবারের পক্ষ হতে সম্প্রতি 'ইতিহাস পূর্ণ লেখন সমিতি' গঠিত হয়েছে? তবে কেন পি.এন. ওকারের মতন - ফেৎনা সৃষ্টিকারী, অখ্যাত ঐতিহাসিকের মিথ্যা-মন-গড়া মন্তব্যকে সত্যের চেয়েও বেশি সম্মান দেওয়া হচ্ছে? সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন —''দেশের আরও কিছু ঐতিহ্যের ইতিহাস এরকম ভাবে বার বার বদলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি। নিজের দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অসম্মান করলে বিশেষ করে সামনে দেশকেই অপমান করা হয়। টিপু সুলতানকে নিয়েও একই ঘটনা আমরা ঘটতে দেখলাম। কুর্গ ও মালাবারে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে টিপু কী অত্যাচার করেছিলেন, তা দিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করা ঠিক নয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে টিপুর লড়াইকে ছোট করার কোনো ভিত্তি নেই। সেটা করলে তা ইতিহাসকে বদলিয়ে দেওয়ারই অপচেষ্টা হয়। সমস্যা হলো, ইতিহাস সামনে রেখে বারবার যে ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে, তার মধ্যে কোথাও 'ইতিহাস' নেই। সবটাই রাজনীতি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাসের নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যেটা সব সয়মই দুর্ভাগ্যজনক।''

মান্যবর সম্পাদককে ধন্যবাদ যে, তিনি ষোলো আনা সত্য কথাই তুলে ধরেছেন। সত্য সত্যই এখন দেশের বড়ো দূরাবস্থা। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে তোলার নানা মনগড়া কেচ্ছা কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে। মসজিদ-মাদ্রাসা কবরস্থান ইত্যাদির অস্তিত্ব ও ইজ্জতের ওপর মনগড়া অভিযোগের ভিত্তিতে ষড়যন্ত্র রচনা করা হচ্ছে। গো-মাংসের নামে জিন্দা, নিরপরাধ মানুষকেও কচু কাটা করা হচ্ছে। বেকসুর যুবকদেরও সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে জেলে পাঠানো হচ্ছে। পবিত্র কুরআনের নামে এবং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নামে মন-গড়া কথা কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চোখের সামনে তাঁদেরই শিষ্য প্রশিষ্যদের দ্বারা প্রত্যহ এ সকল কুকর্ম লাগাতারভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। বিলকুল নিরবতা অথবা অত্যন্ত হালকা সুরের বিরোধিতা করা ছাড়া কাজের মতন কাজ কেউ কিছু করছেন কি? ফলে অকারণে ভয়-আতঙ্ক সৃষ্টিকারীদের শক্তি সাহস এখন দিনানুদিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এ সকল অপকর্মে লিপ্ত মানুষরাও কি আতঙ্কবাদী নয়? মজলুম মানুষদের দাবি যে, সব শ্রেণিরই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতহীনভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ভাজপা সরকার খুব জোরেশোরে প্রচার

করে চলেছে, ''সাবকা সাথ সাবকা বিকাশ'' — খুব ভালো কথা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তো এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কেবল শ্লোগানেই কি সফল হওয়া যায়? স্বাধীনতার পরে দীর্ঘকাল কংগ্রেস সরকার জেনে বুঝে যে সকল ভুল-অপরাধ করে ছিল ভাজপা সরকার এখন অত্যল্প সময়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশি সাংঘাতিক অপরাধগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবেই একের পর এক আঞ্জাম দিয়ে চলছেনা কি? আসল কথা, এখন দেশে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যা কিছু অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে - তা সবকিছুই বিলকুল জেনে বুঝে, সুপরিকল্পিতভাবেই হচ্ছে। উদ্দেশ্যটা হলো এভাবে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নানা বর্ণে গোত্রে বিভক্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা।

পরবর্তী ইলেকসনগুলিতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভোটে জয়যুক্ত হয়ে দেশকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করা। হিন্দু রাষ্ট্র মানে সেখানে মুসলিমদের দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকরূপে বসবাস করা। নতুবা 'ভাগো পাকিস্তান য়্যা কব্রিস্তান' এই অমানবিক শ্লোগানটা তো হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা স্বীধানতার পর হতেই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সগর্বে আউড়িয়ে চলেছে। এখন মোদী-যোগীর যুগে তারা একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। যুগযুগান্তরের দেশীয় ইতিহাসকে সজ্ঞানে উপেক্ষা করে নতুনভাবে দেশের মন-গড়া ইতিহাস রচনা করার জন্য সংঘ পরিবারের পক্ষ হতে সম্প্রতি ইতিহাস নির্মাণ কমিটি তৈরি জঘন্য দুঃসাহস ও বেপরোয়া মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক নয় কি? রামদেবের যোগবিদ্যাকে, যোগাশ্রমকে, সূর্য নমস্কারকে সীমার বাইরে সম্মান দেওয়া কীসের লক্ষণ? তাজমহলকে সদর্পে শিব মন্দির ঘোষণা দিয়ে পার্শ্বস্থ মসজিদে শিবালয় গড়ে তোলার হুমকি দেওয়া সন্ত্রাসবাদেরই পূর্ব লক্ষণ নয় কি? কে দেবে উত্তর?

পবিত্র কুরআন আমাদের শিক্ষা দিয়ে রেখেছে, ''হে মুসলিমগণ! তোমাদেরকে জান ও মাল উভয় দিক হতে পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ হতে অসংখ্য কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। এসব অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো ও আল্লাহ্‌র ভয় রক্ষা করে চলো তবে নিশ্চয় তা হবে অত্যন্ত উচ্চশ্রেণির সাহসিকতার বিষয়''(৩/১৮৬)।

কুরআন আমাদের আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, জালিমের সম্মুখে হক কথা বলো এবং সন্ধ্যা-সকাল এই দুআ গভীর আন্তরিকতা সহকারে মনে মনে আউড়াতে থাকো —''হে আল্লাহ্! ভুলভ্রান্তিবশতঃ আমাদের দ্বারা যা কিছু ত্রুটি হয় - তার জন্য তুমি আমাদের শাস্তি দিও না। হে প্রভু! আমাদের উপর সেই ধরণের বোঝা চাপিয়ে দিও না, যেরূপ পূর্বগামী লোকদের ওপর তুমি চাপিয়েছিলে। হে আল্লাহ্! যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই তা আমাদের ওপর দিও না। আমাদের প্রতি তুমি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো, আমাদের ওপর রহম করো - তুমিই আমাদের মাওলা, আশ্রয়দাতা। কাফেরদের বিপক্ষে তুমি আমাদের সাহায্য দান করো''(২/২৮৬) — আমীন।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কাবায় স্বলাত আদায়ে বাধা প্রদান করা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ কী বলেছেন?

উ:— (৮) তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে (আবু জাহলকে) যে নিষেধ করে? (৯) এক বন্দাকে (রসূলকে) যখন সে স্বলাত আদায় করে। (১০) তুমি কি দেখেছ যদি সে সৎপথে থাকে । (১১) অথবা আল্লাহ্ ভীতির আদেশ দেয়। (১২) তুমি কি দেখেছ যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৩) সে কি জানেনা যে আল্লাহ্ তার সব কিছুই দেখেন। (১৪) কখনই না, যদি সে বিরত না হয় তবে আমরা অবশ্যই তার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে সজোরে টান দেব। (১৫) মিথ্যুক পাপিষ্ঠের কেশ গুচ্ছ। (১৬) অতএব সে তার পরিষদবর্গকে ডাকুক। (১৭)আমরাও অচিরে ডাকব আযাবের ফেরেশতাদের। (১৮) কখনই না, তুমি তার কথা শুনবে না, তুমি সাজদা কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য খোঁজ কর (৯৬:৮-১৮)।

২। প্রশ্ন ঃ উক্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু জাহলের মানসিক আবস্থান কেমন হয়েছিল?

উঃ— আবু জাহল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বাইরে ঠাট বজায় রেখেছিল।

৩। প্রশ্ন ঃ বাইরের ঠাট বজায় রাখার জন্য আবু জাহল কুরায়েশ নেতাদের কি বলেছিলেন?

উঃ— লাত ও উয্যার কসম! যদি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে পুনরায় সেখানে স্বলাতরত দেখি তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমি তার ঘাড়ের উপরে পা দিয়ে তার নাক মুখ থেঁতলে দেব (মুসলিম হাঃ ২৭৯৭)।

৪। প্রশ্ন ঃ এই উক্তি করার পর কী ঘটেছিল ?

উঃ— একদিন আবু জাহল রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে স্বলাত রত অবস্থায় দেখে আস্ফালন করে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ দুই হাত উঁচু করে ভয়ে পিছিয়ে আসেন এবং কাঁপতে কাঁপতে বলেন আমার ও তার মধ্যে একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ড দেখলাম, যা আমার দিকে ধেয়ে আসছিল।

৫। প্রশ্ন ঃ আবু জাহলের উক্তির উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী বলেছিলেন?

উঃ— যদি সে আমার কাছে পৌঁছতে, তাহলে ফেরেশতারা তার এক একটা অঙ্গ ছিন্ন ছিন্ন করে উঠিয়ে নিয়ে যেত (মুসলিম হাঃ ২৭৯৭)।

৬। প্রশ্ন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর আল্লাহ্র সরাসরি সাহায্য প্রত্যক্ষ করেও আবু জাহল তার হঠকারিতা থেকে ফিরে আসেনি কেন?

উঃ— কেবলমাত্র নেতৃত্বের অহংকারে স্ফীত হওয়ার কারণে। নমরূদ, ফেরাউন, আবু জাহল সহ যুগে যুগে সকল হঠকারী নেতাদের চরিত্র একই।

৭। প্রশ্ন ঃ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কাবা ঘরে গিয়ে স্বলাত আদায় করলে, কাফেররা কীভাবে স্বলাতে বিঘ্ন ঘটাতো।

উঃ— তখন কাফেররা তাদের লোকজন নিয়ে কাবা গৃহে এসে জোরে জোরে হাত তালি বাজাত ও শিস দিত। আল্লাহ্ বলেন, ‘আর বায়তুল্লাহ্র নিকটে তাদের ইবাদত বলতে শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতএব তোমরা অবিশ্বাসের শাস্তি আস্বাদন কর (সূরাহ্ আনফাল ৩৫)।

৮। প্রশ্ন ঃ রসূলের কুরআন তেলাওয়াত যাতে কেউ শুনতে না পায় সেইজন্য কাফেররা কি করত?

উঃ— কাফেররা হৈ-হুল্লোড় ও হট্টগোল করত। আল্লাহ্ বলেন, ‘আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শুনো না এবং এর তেলাওয়াত কালে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা বিজয়ী হও’ (ফুসসিলাত / হা-মীম সাজদা - ২৬)।

৯। প্রশ্ন ঃ নব মুসলিমদের নিজেদের দলে ফিরিয়ে আনার জন্য ও নিজেদের লোকদেরকে নিজেদের দলে ধরে রাখার জন্য কাফের নেতৃবৃন্দ কী যুক্তি প্রদর্শন করত?

উঃ— যদি মুহাম্মাদ সত্য নবী হতেন ও তার আনীত কুরআন সত্য কিতাব হত, তাহলে তা অমান্য করার অপরাধে আমাদের উপর কওমে লূতের মত গযব নাযিল হয় না কেন?

১০। প্রশ্ন ঃ কাফের নেতৃবৃন্দের উক্ত যুক্তি জবাবে মহান আল্লাহ্ কী বলেন?

উঃ— আর স্মরণ কর, যখন তারা প্রার্থনা করেছিল, যদি এইব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সত্য নাবী হয়ে থাকে তোমাদের পক্ষ হতে, তাহলে তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাও। অথচ আল্লাহ্ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা (মক্কার দুর্বল মুসলিমরা) ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে (আনফাল ৩২-৩৩)।

১১। প্রশ্ন ঃ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কোন কুরাইশ নেতাকে হাবশার বাদশাহ নাজাশীর দরবারে দূত হিসাবে পাঠিয়েছিল?

উঃ— উমারাহ্ বিন ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ্ মাখযুমীকে।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ মেয়েরা কত বছর বয়সে মাথার চুল রাখবে? তারা কি চুল ছোট করে রাখতে পারবে? — মায়েদা সুলতানা, হরিহরপাড়া ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ধূলিয়ান

উত্তর ঃ— কত বছর বয়স থেকে মেয়েরা মাথার চুল রাখবে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো দলীল নেই। চুল হল নারীদের সৌন্দর্যের প্রতীক। এটি আল্লাহ্‌র এক অমূল্য নেয়ামত। মেয়েদের চুল তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াই কাম্য। যদিও কোনো বয়সের উল্লেখ নেই। মেয়েরা কোনো অবস্থাতেই মাথা মুণ্ডন করতে পারে না। সুতরাং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত যে, হজ্জ ও উমরার সময়েও মেয়েরা মাথা মুণ্ডন করবে না; বরং মাথার চুল (আঙ্গুলের অগ্রভাগের সমপমিাণ অর্থাৎ প্রায় দুই সেন্টিমিটারের সমান) কর্তন করবে (আবূ দাউদ ১৯৮৫, দারেমী ১৯৪৬, দারাকুতনী ২৬৬৬)। এত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জ ও উমরাহ্ ব্যতীত অন্য সময়ে মেয়েরা তাদের চুলের সংরক্ষণ করবে। কেননা তা তাদের সৌন্দর্য। কাফির ও ফাসিক মহিলাদের ন্যায় মাথার চুল ছোট করে রাখা তাদের জন্য বৈধ নয় (মাজমূ ফাতাওয়া শাইখ সালিহ্ বিন ফাওযান ২/৬০১)। মাথার তুল ছোট করে রাখা মূলতঃ পুরুষদের বৈশিষ্ট্য।

অতএব মেয়েদের চুল ছোট করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা পুরুষদের মত ছোট করে চুল রাখা তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণকারীনি মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষদের উপর অভিসম্পাত করেছেন (আবূ দাউদ ৪০৯৭, তিরমিযী ২৭৮৪)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের ন্যায় লম্বা লম্বা চুলধারী পুরুষেরাও নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যবানে অভিশপ্ত। তবে ইসলামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিধান স্বলাতও ১০ বছরের পূর্বে ফরয হয় না। যেহেতু চুল নারীর সৌন্দর্য, আর চুলের সৌন্দর্য হল ঘন হওয়া, সুতরাং চুল ঘন করার জন্য বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত মাথা নাড়া করা যেতে পারে। কিন্তু যখন থেকে তারা চুলের সৌন্দর্য বুঝতে শিখবে, যত্ন নিতে শিখবে, তখন থেকেই চুল মুণ্ডন করবে না।

২। প্রশ্ন ঃ "যে ব্যক্তি ফজরের স্বলাত আদায়ের পর কোনো কথা বলার পূর্বেই ১০০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সে যখনই সূরা ইখলাস পাঠ করবে তখনই তার এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে" এ হাদীসের বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন। — নাসীমা, হাওড়া

উত্তর ঃ অত্র হাদীসটি জাল (সিলসিলাহ্ যঈফা ৪০৫)।

৩। প্রশ্ন ঃ ফজরের স্বলাত গালাসে পড়া উত্তম না কি ইসফারে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইসফারে কয়দিন স্বলাত আদায় করেছেন? — নূরুদ্দিন, হুগলী।

উত্তর ঃ ফজরের স্বলাত গালাসে পড়াই উত্তম (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/১৩১, ফাতাওয়া শাবকাতে ইসলামিয়া ১১/৫০৭৬)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একবারই ইসফারে অর্থাৎ ভোরের আলো প্রকাশিত হওয়ার সময় ফজরের স্বলাত শুরু করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমৃত্যু গালাসে ফজরের স্বলাত আদায় করেছেন (আবূ দাউদ ৩৯৪, ইবনু খুযাইমাহ্ ৩৫২, ইবনু হিব্বান ১৪৯৪, বাইহাক্বী ২০৪৫, ইরওয়াউল গালীল ২৪৯)।

৪। প্রশ্ন ঃ স্বলাতের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া যাবে কী? — কেতাবুদ্দীন, অন্তর্দ্বীপ, ধুলিয়ান।

উত্তর ঃ ইবনু উমার (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেন, (একদা) বিলাল (রাযি আল্লাহু আনহু) ফজরের স্বলাতের আযান স্বলাতের সময় হওয়ার পূর্বেই দিলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে (সময় হওয়ার পরে) পুনরায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন (আবূ দাউদ ৫৩২, সহীহ্ আবূ দাউদ ৫৪২)। সৌদী ফাতাওয়া কমিটি বলেন, সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া বৈধ নয়। যে ব্যক্তি ভুলবশতঃ সময়ের পূর্বেই আযান দিবে, তার জন্য অপরিহার্য হল সময় হওয়ার পরে পুনর্বার আযান দেওয়া। তবে ফজরের স্বলাতের ক্ষেত্রে দুটি আযান দেওয়া যায় — একটি ফজরের স্বলাতের সময় হওয়ার পূর্বে এবং একটি সময় হওয়ার পরে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৮১)। অত্র ফাতাওয়ার তাৎপর্য হল ঃ ফজরের ক্ষেত্রে যেখানে সুন্নতি দুটি আযান লাগু আছে কিংবা তা কেউ লাগু করবে, সেখানে সময়ের পূর্বে একটি আযান দেওয়া শরীআত সম্মত এবং দ্বিতীয় আযান সময় হওয়ার পরে দিতে হবে। কিন্তু আযান যদি একটিই দেওয়া হয়, আর তা সময় হওয়ার পূর্বেই দেওয়া হয়, তাহলে তা ফজরের স্বলাতের জন্য যথেষ্ট হবে না। এ কথাই বলেছেন মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (তুহফা ১/৫১৪)। আমরা মুআয্যিনদের বিশেষভাবে সতর্ক করতে চাই যে, যে সকল মুয়ায্যিন ফজরের সময় হওয়ার ১০-২০ মিনিট

পূর্বেই ফজরের স্বলাতের আযান দিচ্ছেন আর তাদের আযানের কারণে অসময়ে অনেক মহিলা স্বলাত আদায় করে নিচ্ছেন, এর জন্য কি সেইসব মুয়ায্যিনরা দায়ী নন, যারা সময়ের পূর্বেই আযান দিচ্ছেন। সৌদী ফাতাওয়া কমিটি বলেন, সময়ের পূর্বেই স্বলাত আদায় করা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমাহ্‌র পরিপন্থী (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৮৪)। সৌদী আরবের বিখ্যাত গবেষক শাইখ ইবনু উসাইমীন বলেন, যদি সময় হওয়ার এক মিনিটও পূর্বে আযান দেওয়া হয় তাহলে তা সঠিক হবে না। কেননা আযানের বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত হল স্বলাতের সময় হওয়া, যেমন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যখন স্বলাতের সময় হবে (ফাতাওয়া নূর ৮/২)। তবে সময় হওয়ার কিছুটা বিলম্বে আযান দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

৫। প্রশ্ন ঃ আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে যে, স্বলাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর কমপক্ষে তিনটি আয়াত পাঠ করা আবশ্যিক। কিন্তু পবিত্র কাবার ইমাম সাহেবকে একদা সূরা ফাতিহার পর কেবলমাত্র আয়াতুল কুরসী পাঠ করতে শুনেছি। আয়াতুল করসী তো একটি আয়াত। তাহলে কি সূরা ফাতিহার পরে তিনটি আয়াত পড়া আবশ্যিক নয়? — মাষ্টার মুয্যাম্মিল, মহব্বতপুর, ধুলিয়ান।

উত্তর ঃ সূরা ফাতিহার পরে তিনটি আয়াত পাঠ করা স্বলাতে আবশ্যিক নয়; বরং সূরা ফাতিহার পরে যা পাঠ করা হবে তা সুন্নাত (ফাতাওয়া নূর শাইখ ইবনু বায ৮/২২৭)। আবূ হুরাইরা (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেন, প্রত্যেক স্বলাতেই কিরাআত করা হয়। তবে যে সব স্বলাত রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদের শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের শুনিয়ে পড়ব। আর যে সব স্বলাতে আমাদের না শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের না শুনিয়ে পড়ব। যদি কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পড়, তবে স্বলাত হয়ে যাবে। আর যদি (তার চেয়ে) বেশি পড় তবে তা উত্তম (বুখারী ৭৭২)। ইবনু আব্বাস (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অধিকাংশ সময়ে ফজরের সুন্নাতের প্রথম রাকাআতে সূরা বাক্বারাহ্ ১৩৬ নং আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা আলে ইমরাণের ৬৪ নং আয়াত পাঠ করতেন (মুসলিম ৭২৭, আহমাদ ২০৪৫, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ ১১১৫, মুস্তাদরাক ১১৫২)।

৬। প্রশ্ন ঃ এক ঘণ্টা গবেষণা করা ৬০ বছরের ইবাদত থেকেও উত্তম। অত্র হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। — তাবাস্সুম খাতুন, হাওড়া।

উঃ— হাদীসটি জাল (যঈফুল জামে ৩৯৮৮, সিলসিলাহ্ যঈফা ১৭৩, মাওযুআত ইবনুল জাওযী ৩/১৪৪)।

৭। প্রশ্ন ঃ অযু থাকা অবস্থায় অযু করা ''নূর আলা নূর'' হাদীসের বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন। — রফীকুল ইসলাম, ফারাক্কা।

উত্তর ঃ অত্র হাদীসটি ভিত্তিহীন (যঈফুত্ তারগীব ঃ ১৪০)। উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি অযু থাকা সত্বেও পুনরায় অযু করে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয় মর্মে বর্ণিত হাদীসটিও যঈফ (যঈফ আবূ দাউদ ১০)।

৮। প্রশ্ন ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''তোমাদের কেউ যখন অযু করবে তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে তার পা না ধোয়'' — এ হাদীসের বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন। — রেহসান, টাউনশিপ, ফারাক্কা।

উত্তর ঃ অত্র হাদীসটি জাল (যঈফুল্ জামে ৪৪১, বায়ানুল ওয়াহ্মে ওয়াল ইহাম ৯০০)।

৯। যদি একটি সাবালক মুসলিম ছেলে ও একটি সাবালিকা হিন্দু মেয়ে বিয়ে করতে চায়। আর এই বিয়েতে মেয়ের পরিবারের সম্মতি না থাকে তাহলে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে কি? যদি পারে তাহলে কীভাবে জানিয়ে বাধিত করবেন। — ফাইজাল ইকবাল, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ ।

উত্তর ঃ একজন হিন্দু (মুশরিক) মেয়ের বিয়ে কোনো মুসলিমের সাথে বৈধ নয় (সূরা বাক্বারাহ্ ২২১, ইবনু কাসীর ১/৫৮২)। অতএব ঐ মহিলার পরিবারের সম্মতি থাকলেও বিবাহ বৈধ হবে না। অবশ্য স্বেচ্ছায় সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে,তবে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এক্ষেত্রে তার অভিভাবক হবে মুসলিম কাযী। কেননা ইসলামী শাসক হল তার অভিভাবক, যার কোনো অভিভাবক নেই। আর কাযী হল এরূপ ক্ষেত্রে তার স্থলাভিষিক্ত (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৮/১৪৭)।

অতএব সে যদি দ্বীনে ইসলামে দীক্ষিত হয়, আর তার পরিবার হিন্দু থাকে এবং অত্র বিবাহতে অসম্মতি প্রকাশ করে তবুও তার বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা কোনো কাফির ও মুশরিক, ঈমানদারের অভিভাবক হতে পারে না। উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তিকে বলপূর্বক মুসলিম বানানো যাবে না (সূরা বাক্বারাহ্ ২৫৬, তাফসীর সহ)।

১০। প্রশ্ন ঃ বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কোনো যুবতীকে দর্শনের পর পছন্দ হলে ও তাদের বিবাহের সিদ্ধান্ত অভিভাবকদের দ্বারা পাকাপাকি হয়ে গেলে টেলিফোনে ওদের কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে কি? — নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মহালন্দি, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ না, ফোনে কথা বলা যাবে না। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মোহর নির্ধারণ করে ইজাব ও কবুল না হচ্ছে তারা একে অপরের জন্য অপরিচিত ব্যক্তির মত। এভাবেই ব্যভিচারের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সজাগ হতে হবে। এই ফোনের সুযোগে কত যে অবৈধ কাজ হচ্ছে তার প্রকৃত হিসাব আল্লাহ্ই জানেন।

১১। প্রশ্ন ঃ সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আছে দাঁড়িয়ে পানি পান করা নিষেধ, কিন্তু বুখারীতে আছে যে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দাঁড়িয়ে পান করেছেন। এক্ষণে আমরা কোন্ হাদীসের উপর আমল করব। — লাল মুহাম্মাদ, গোপালপুর, নদীয়া।

উত্তর ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই দাঁড়িয়ে পান না করে, কেউ ভুলবশতঃ এমনটা করে ফেললে সে যেন বমি করে দেয়" (সহীহ্ মুসলিম ১১৬, মিশকাত ৪২৬৭)।

আলী (রাযি আল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন অতঃপর বলেন, দাঁড়িয়ে পান করলে কিছু লোক ঘৃণা করে; অথচ আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে এটা করতে দেখেছি যেমন তোমরা আমাকে দেখছো (সহীহুল বুখারী ৫৬১৫)। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, 'হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, বিনা কারণে দাঁড়িয়ে পানি পান করাটা হারাম। তবে অনেক হাদীসে মহান নাবীর দাঁড়িয়ে পান করার কথা বর্ণিত হয়েছে। সামঞ্জস্য বিধান এইভাবে করা সম্ভব যে, তাঁর এই আমলের পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ ছিল। যেমন বসার জন্য স্থান প্রশস্ত না হওয়া অথবা উঁচু কোনো স্থানে পানি থাকা (যেমন বর্তমানে রেল-বাস স্টেশনে উঁচুতে ট্যাপের ব্যবস্থা থাকা ইত্যাদি)।" অন্যান্য আলিমগণ উত্তম অনুত্তমের দিকে গেছেন। বিজ্ঞানেও দাঁড়িয়ে পানের ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

১২ প্রশ্ন ঃ চর্মরোগের কারণে রেশমী পোশাক পরিধান করা যাবে কি? — ডাঃ আশরাফুল হক, অন্তর্দ্বীপা, ধুলিয়ান।

উত্তর ঃ পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম একান্ত প্রয়োজন ছাড়া। যেমন চর্মরোগ, এর জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা যাবে রোগ দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৪/৪৯)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যুবায়ের ও আব্দুর রহমানকে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন (বুখারী ৫৮৩৯, মুসলিম ২০৭৬)।

১৩। ''আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মতো স্বলাত পড়ে দেখাবো না? তারপর তিনি স্বলাত পড়লেন এবং শুধুমাত্র একবার রাফয়ে ইয়াদায়েন করলেন"। শামসুর রহমান কাসেমী অত্র হাদীস উল্লেখ করার পরে বলেছেন রাফয়ে ইয়াদায়েন করার হাদীস মানসূখ (হানাফী মাযাব ১/৯৪- ৯৫ পৃঃ)। কাসেমী সাহেবের কথাটি কি সঠিক?— রিপন, জলঙ্গী।

উত্তর ঃ কথাতেই আছে, 'চোরের মায়ের গলা বড়'। হাদীস সহীহ্ই হল না। আর তার দ্বারা রাফয়ে দায়েন করার হাদীসকে মানসূখ বলে দাবী করা ডুবন্ত মানুষের খড়কুটোর আশ্রয়ের নামান্তর। কাসেমী সাহেব হাদীসটি নকল করেছেন আবূ দাউদ থেকে। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি বর্ণনার পরেই সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে, 'এটা একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার। এ শব্দে হাদীসটি সহীহ্ নয়' (আবূ দাউদ ৭৪৮)। অত্র হাদীসটি উসূলে হাদীসের ভিত্তিতে সমস্ত মুহাদ্দিসের নিকটে যঈফ, তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা সুফয়ান সাওরী আসিম থেকে আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর সুফয়ান সাওরী বিখ্যাত মুদাল্লিস রাবী (মুদাল্লিসীন ২১, আসমাউল মুদাল্লিসীন ১৮)। কাসেমী সাহেবদের ইমাম- আইনী হানাফী বলেন, সুফয়ান মুদাল্লিস, আর মুদাল্লিসের আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা দ্বারা সকলের ঐক্যমতেই দলীল গ্রহণ করা যাবে না যতক্ষণ না অত্র হাদীসের ব্যাপারে অন্যসূত্রে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হচ্ছে (উমদাতুল কারী ৩/১১২)। অত্র হাদীসের কোনো সূত্রেই সুফয়ানের শ্রবণ সাব্যস্ত নেই (তানকীল ২/৭৭২)। মাহমূদ হাসান দেওবন্দী বলেন ঃ আমরা বলব, 'মুদাল্লিস রাবী যদি আন্ আন্ শব্দে হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সমস্ত মুহাদ্দিসের ঐক্যমতে সেই হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না' (ঈযাহুল আদিল্লাহ্ ১৫৪ পৃঃ)। উল্লেখ্য, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কিংবা কোনো সাহাবী থেকে রাফয়ে ইয়াদায়েন না করার একটিও সহীহ্ হাদীস নেই (ইমাম বুখারী জুয্উ রাফইল ইয়াদায়েন ৩৯

পৃঃ)। কাসেমী সাহেবের উল্লেখিত হাদীসকে ইমাম বুখারী, হুমাইদী, ইবনু আদম, আহমাদ, ইবনুল মুবারক, আবূ দাউদ, আবূ হাতিম, দারাকুতনী, দারেমী, বাইহাক্বী, ইবনু হিব্বান প্রমুখ ইমামগণ যঈফ বলেছেন (তান্‌যীহুশ্‌ শারীয়াহ্‌ ২/২০১)।

১৪। প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ বলেছেন, হোমিওপ্যাথিক সেবন করা হারাম। কেননা তাতে অ্যালকোহল আছে। আর অ্যালকোহল হারাম। অবশ্য যে অসুখ কোনো প্যাথিতে ভালো হয় না, সেই অসুখ যদি হোমিওপ্যাথিতে আরোগ্য হয় তবে কোনো সমস্যা নেই। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। — ডাঃ মোঃ ঈসা, তালগ্রাম হাট, মালদা।

উত্তর ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, ''তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন'' (সূরা বাক্বারাহ্‌ ২৯)। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রত্যেক জিনিসই মূলতঃ হালাল যতক্ষণ না কোনো জিনিসের হারাম হওয়ার কথা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হবে (ফাৎহুল বারী ১/৭১)।

ইবনু সুওয়াইদ (রাযি আল্লাহু আনহু) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে তার ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, আমি তা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করি। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, এটা কোনো ঔষধই নয়; বরং এটা নিজেই একটা রোগ (মুসলিম ১৯৮৪, তিরমিযী ২০৪৬, আবূ দাউদ ৩৮৭৩)। ইবনু মাসঊদ (রাযি আল্লাহু আনহু) নেশা দ্রব্য সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর যে সব বস্তু হারাম করেছেন তাতে তোমাদের জন্য কোনো রোগমুক্তির উপাদান নেই (বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৭৯, ইবনু আবী শাইবাহ্‌ ২৩৮৩২)। সৌদী ফাতাওয়া কমিটি বলেছেন, ক্বুরআন, সুন্নাহ্‌ ও ইজমা দ্বারা মদ হারাম। অতএব ঔষধ হিসাবে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা হারাম বস্তুতে উম্মাতের জন্য রোগমুক্তির কোনো উপাদান রাখেন নি (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১, ২২/৮৯)। তাঁরা বলেছেন —

لا يجوز خلط الادوية بالكحول المسكرة لكن لو خلطت بالكحول المسكرة جاز استعمالها اذا كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر اثرها فى لون الدواء ولا طعمه و لا ريحه و الا حرم استعمال ما خلط بها.

অর্থ ঃ নেশাদার অ্যালকোহলের সাথে ঔষধের সংমিশ্রণ বৈধ নয়, কিন্তু তাতে যদি অ্যালকোহলের সংমিশ্রণ থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয যদি অ্যালকোহলের পরিমাণ এমন কম হয় যে, তার লক্ষণ ঔষধের রং, স্বাদ ও গন্ধে প্রকাশ না পায়। অন্যথায় তার ব্যবহার অবৈধ হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৫/৩০)।

আমাদের জানা মতে হোমিওপ্যাথিতে যে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় তা ঔষধ হিসাবে নয়, বরং ঔষধের সংরক্ষণ হিসাবে এবং ঐ অ্যালকোহল নেশার জন্য তৈরি করা হয় না বরং ঔষধের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই তা তৈরি করা হয়। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, হোমিওপ্যাথি সেবন আরোগ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। অতএব হোমিওপ্যাথি অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কেননা হারাম বস্তুতে কোনো আরোগ্য নেই। প্রায় একই কথা বলেছেন সৌদী আরবের বিখ্যাত গবেষক শাইখ ইবনু উসমাইমীন রহমাতুল্লাহি আলাইহ —

و انما جعلت فيه مادة الكحول من اجل حفظه فان ذلك لا باس به لا نه ليس لمادة الكحول اثر فيه.

(মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল ১৭/৩১)।

তদুপরি আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে আমরা প্রার্থনা করি এমন ব্যক্তির, যিনি এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করবেন যাতে অ্যালকোহল ছাড়াই ঔষধ সংরক্ষণ করা যায়।

উল্লেখ্য যে, যারা বলেন, নিরুপায় অবস্থায় হারাম বস্তুকে ঔষধ হিসাবে সেবন করা যায়, তাদের সে কথা সঠিক নয়। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হারাম বস্তুতে কোনো আরোগ্য নেই। অতএব হারাম বস্তুকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা বৈধ নয় (মাজমূ ফাতাওয়া শাইখ ইবনু উসাইমীন ১৭/৩০)।

১৫। প্রশ্ন ঃ বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কোনো যুবতীকে দর্শনের পর পছন্দ হলে ও তাদের বিবাহের সিদ্ধান্ত অভিভাবকদের দ্বারা পাকাপাকি হয়ে গেলে টেলিফোনে ওদের কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে কি? — নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মহালন্দি, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ না, ফোনে কথা বলা যাবে না। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মোহর নির্ধারণ করে ইজাব ও কবুল না হচ্ছে তারা একে অপরের জন্য অপরিচিত ব্যক্তির মত। এভাবেই ব্যভিচারের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সজাগ হতে হবে। এই ফোনের সুযোগে কত যে অবৈধ কাজ হচ্ছে তার প্রকৃত হিসাব আল্লাহ্‌ই জানেন।

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই ডিসেঃ-১৫ই জানুঃ)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহুর	আসর	মাগরিব	ইশা
১৬ ডিসেঃ	৪:৫৩	৬:১৩	১১:৩৩	২:৩৩	৪:৫৩	৬:১৪
১৭	৪:৫৩	৬:১৩	১১:৩৪	২:৩৩	৪:৫৩	৬:১৪
১৮	৪:৫৪	৬:১৪	১১:৩৪	২:৩৪	৪:৫৪	৬:১৪
১৯	৪:৫৪	৬:১৪	১১:৩৫	২:৩৪	৪:৫৪	৬:১৫
২০	৪:৫৪	৬:১৪	১১:৩৫	২:৩৪	৪:৫৪	৬:১৫
২১	৪:৫৫	৬:১৫	১১:৩৫	২:৩৪	৪:৫৪	৬:১৫
২২	৪:৫৬	৬:১৬	১১:৩৬	২:৩৫	৪:৫৫	৬:১৬
২৩	৪:৫৬	৬:১৬	১১:৩৭	২:৩৬	৪:৫৬	৬:১৭
২৪	৪:৫৭	৬:১৭	১১:৩৭	২:৩৭	৪:৫৬	৬:১৭
২৫	৪:৫৭	৬:১৭	১১:৩৮	২:৩৭	৪:৫৭	৬:১৮
২৬	৪:৫৮	৬:১৮	১১:৩৮	২:৩৮	৪:৫৮	৬:১৯
২৭	৪:৫৮	৬:১৮	১১:৩৯	২:৩৮	৪:৫৮	৬:১৯
২৮	৪:৫৯	৬:১৮	১১:৩৯	২:৩৯	৪:৫৯	৬:২০
২৯	৪:৫৯	৬:১৯	১১:৪০	২:৩৯	৪:৫৯	৬:২০
৩০	৪:৫৯	৬:১৯	১১:৪০	২:৪০	৫:০০	৬:২১
৩১	৫:০০	৬:১৯	১১:৪১	২:৪১	৫:০১	৬:২১
১লা জানুঃ	৫:০০	৬:২০	১১:৪১	২:৪১	৫:০১	৬:২২
২	৫:০০	৬:২০	১১:৪১	২:৪১	৫:০১	৬:২২
৩	৫:০০	৬:২০	১১:৪২	২:৪২	৫:০২	৬:২৩
৪	৫:০১	৬:২০	১১:৪২	২:৪৩	৫:০৩	৬:২৩
৫	৫:০১	৬:২১	১১:৪২	২:৪৩	৫:০৩	৬:২৪
৬	৫:০১	৬:২১	১১:৪৩	২:৪৪	৫:০৪	৬:২৫
৭	৫:০২	৬:২১	১১:৪৩	২:৪৫	৫:০৫	৬:২৫
৮	৫:০২	৬:২১	১১:৪৪	২:৪৫	৫:০৬	৬:২৬
৯	৫:০২	৬:২১	১১:৪৪	২:৪৬	৫:০৬	৬:২৬
১০	৫:০২	৬:২১	১১:৪৫	২:৪৭	৫:০৭	৬:২৭
১১	৫:০২	৬:২২	১১:৪৫	২:৪৭	৫:০৮	৬:২৮
১২	৫:০২	৬:২২	১১:৪৫	২:৪৮	৫:০৮	৬:২৮
১৩	৫:০৩	৬:২২	১১:৪৬	২:৪৯	৫:০৯	৬:২৯
১৪	৫:০৩	৬:২২	১১:৪৬	২:৪৯	৫:১০	৬:৩০
১৫	৫:০৩	৬:২২	১১:৪৭	২:৫০	৫:১১	৬:৩০

মাসিক "সরল পথ" ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা • রবিউল আওয়াল- ১৪৩৯ • ডিসেম্বর - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

মূল্য - ১৮/- টাকা মাত্র Printed by : S.F. Printers, Beldanga, 9434 531 957